খেলার কথা



১৬ জুন, ১৯৭৮





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

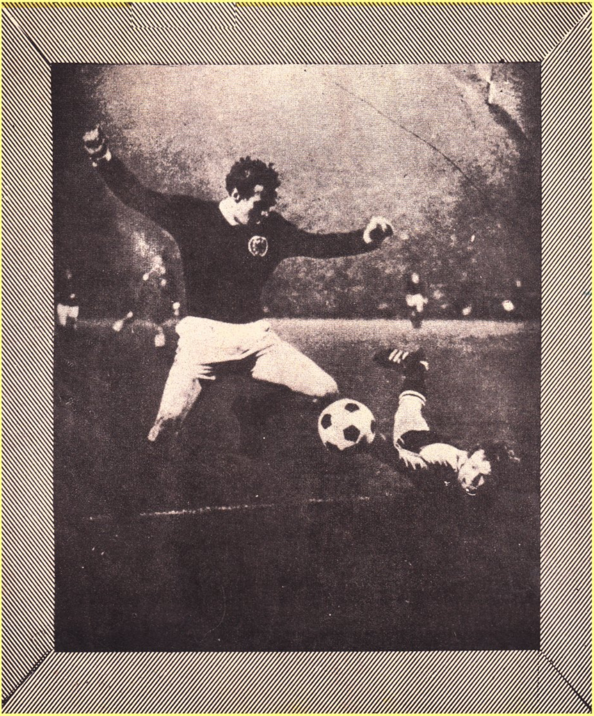
হার্ডকপি ও স্ক্যান ঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এডিট ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



বিখ্যাত জার্মান গোলকীপার মায়ার অবধারিত গোল বাচাচ্ছেন গ্লাসগো রেঞ্জার্স ক্লাবের ষ্ট্রাইকার কলিন ষ্টেনের পা থেকে। এই মায়ারই এখন পৃথিবীর এক নম্বর গোলকীপার।

এই সংখ্যায়

সম্পাদক : প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত

সহযোগী সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

খেলার কথা

খেলার কথার প্রথম সংখ্যা অনেক ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েছে। প্রচুর প্রশংসার মধ্যে দুটি অভিযোগ জ্বলজ্বল করছে আমাদের অফিসে আসা অনেক চিঠিতেই।

এক নম্বর অভিযোগ খেলার কথার চেহারা আরো বেশী ছিমছাম হওয়া উচিৎ। আমাদের উত্তর : আমরা চেষ্টা করছি যথাসম্ভব নির্ভুল এবং পরিপাটি হবার।

দ্বিতীয় অভিযোগ একজন পাঠকের ভাষায় : "হায়, শুধুই ফুটবল ?" না। তবে অনেকটাই ফুটবল। অন্যান্য খেলাধূলোর খবর অবশ্যই কিছু কিছু থাকবে। কিন্তু আমরা প্রাধান্য দিতে চাই ফুটবলকে। কারণ বাঙালীর প্রিয় খেলা ফুটবল। এবং খেলার কথা একটি বাংলা পাক্ষিক।

শিল্পী : হরিমোহন বাগলি

সহযোগী শিল্পী : সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুপ রায়

প্রচ্ছদের ছবি : জয়ন্ত শেঠ।

ভিতরের রঙীন ছবি : প্রদীপ সোম।

অন্যান্য ছবি : প্রদীপ সোম। জয়ন্ত শেঠ, সন্তোষ ঘোষ এবং শান্তি সেন।

দাম : এক টাকা তিরিশ পয়সা



ভেঙ্কটেশকে ভোলা যায়না

শৈলেন মান্না

অনেকদিন ইস্টবেঙ্গলে খেলার পরে ১৯৫৫ সালে ভেঙ্কটেশ মোহনবাগানে সই করল। প্রথম দিন মোহনবাগান প্র্যাকটিসে ওকে দেখেই আমি বলেছিলাম, "যাক, একটা দুশ্চিন্তা আমার কমল। তোমাকে আটকানোর কথা ভেবে আর ঘুম নষ্ট হবেনা।

ভেঙ্কটেশ ছিল ইস্টবেঙ্গলের বাঘা রাইট উইঙ্গার। আমি ছিলাম মোহনবাগানের লেফট ব্যাক। খেলার মাঠে আমাদের তাই মুখোমুখি হতেই হত। আমাকে কতোবার কাটিয়ে গেছে। আমিও মাঝেমাঝে আটকে দিয়েছি। কিন্তু কখনো কোন স্বার্থ কথার বিনিময় হয়নি। তখন মাঠের বাইরেতো বটেই, মাঠের মধ্যেও আমরা ছিলাম গভীর বন্ধু।

১৯৫৫ সালে যখন মোহনবাগানে এল, ভেঙ্কটেশের তখন পড়তি ফর্ম। তবু সেই ফর্মেও মোহনবাগানের হয়ে একটা বড় কাজ ও করেছিল। রোভার্স কাপ সেমিফাইনালে টাটা স্পোর্টসের কাছে খেলা শেষ হবার এক মিনিট আগেও এক গোলে মোহনবাগান হারছিল। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল, একজন ছাড়া। এক দুর্দান্ত গোল করে ভেঙ্কটেশ খেলা ড্র করল। সেবার শেষ পর্যন্ত জিতল মোহনবাগান। সেই প্রথম বোম্বাই থেকে রোভার্স নিয়ে ফিরল মোহনবাগান।

সেবার পা ভাঙা থাকায় আমি রোভার্স খেলতে যাইনি। ভেঙ্কটেশের স্ত্রী তখন আমাদের বাড়িতেই ছিল। ভেঙ্কটেশ বোম্বাই থেকে ফিরে যখন ওর স্ত্রীকে নিতে এল, তখন ওর মুখে দেখেছিলাম তৃপ্তির হাসি। এমনিতে তখন ফর্মে না থাকায় ওর দুঃখ ছিল। রোভার্সে একটা কাজের কাজ ক্লাবের হয়ে করতে পারায় ওর খুশি হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

ভেঙ্কটেশ অনেক কিছু দিয়েছে আমাদের। কিন্তু কী পেয়েছে? মাঠের হাততালি মিলিয়ে যাবার পর ওর কথা কি কেউ মনে রেখেছে? শেষ এক বছর ওর চাকরিও ছিলনা।

প্রথম প্রশ্ন, এখন কী করা যায়? ভেঙ্কটেশ আর ফিরবে না। কিন্তু একজন সেরা ফুটবলারের পরিবারকে আমরা বাঁচাতে পারি। আগে দরকার ভেঙ্কটেশের বড় ছেলের জন্য একটা চাকরি। আমরা নানা জায়গায় কথা বলে দেখছি। ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক বা অন্য কোথাও হয়তো হয়ে যাবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকেও বলেছি, খুব তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করার জন্য।

আই এফ এ একটি চ্যারিটি ম্যাচ এর জন্য ধরে রাখছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রস্তাব করেছি, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সদস্যরা দু'টাকা করে দিন। কারো গায়ে লাগবেনা। কিন্তু ভেঙ্কটেশের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া যাবে বেশ কিছু টাকা। এছাড়া মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল এই ফাণ্ডের জন্য কাছাকাছি কোনো জায়গায় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে পারে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গেই উঠতে বাধ্য কিছু বড় প্রশ্ন। সব ফুটবলারদেরই ভেঙ্কটেশের মতো অবস্থায় পড়তে হবে কেন? দিনের পর দিন জলে কাদায় রোদে ঝড়ে যারা প্রানপণে আনন্দ দিয়েছে হাজার হাজার মানুষকে—ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকুও তাদের থাকবেনা কেন? সাত্তার, ধনরাজের মতো নামী ফুটবলার—যারা এখনও আছে—তাদের জন্যই বা আমরা কতটা ভাবছি? প্রায় সকলেরই তো সম্বল বলতে একটা সাধারণ চাকরি। বছরের পর বছর শরীর নিংড়ে ফুটবল খেলার পর এইতো পুরস্কার!

লেখা শেষ করার আগে আমি একটি কৈফিয়ৎ দিতে চাই। ভেঙ্কটেশের মৃত্যুর পর মোহনবাগান ক্লাব সম্পর্কে এমনভাবে খবর ছাপা হয়েছে যেন দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে আমরা কিছু খরচ করতে চেয়েছি।

ভেঙ্কটেশ মোহনবাগানে খেলেছে, যতদিনই হোক। সুতরাং ক্লাবের একটা দায়িত্বতো আছেই। তাছাড়া খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশতো আমাদের সকলের প্রিয়। মোহনবাগান ক্লাব শুধু একজন আদর্শ ফুটবলারের পরিবারের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে।

অবশ্য সাধ যত, সাধ্য হয়তো তত নেই। কিন্তু আমাদের সদিচ্ছায় কোনো খাদ নেই। আমি বিশ্বাস করি, যদি সকলে মিলে চেষ্টা করি, তাহলে ভেঙ্কটেশের পরিবারকে মোটামুটি নিরাপত্তা এনে দেওয়া সম্ভব। মাঠের মধ্যে ভেঙ্কটেশ আমাদের এত কিছু দিয়ে গেছে. তার বিনিময়ে ওর পরিবারকে এতটুকু নিরাপত্তা কি আমরা দিতে পারিনা।

ইষ্টবেঙ্গল হারার পরে

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ লীগ শুরু হবার আগে বলরাম দুঃখ করেছিলেন ঃ "এখন লীগ মানেইতো মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল লীগ ম্যাচ!" কিন্তু ৮ জুন বিকেলেই গত কয়েক বছরের এই ছক ভেঙে খানখান হয়ে গেল। উয়াড়ি হারিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গলকে।

আগে এমন হত। কিন্তু ছোট টীমের হাতে বড় টীমের হার অনেক দিন বাদে ঘটল। হয়তো ময়দানের হাওয়া এবার ঘুরবে। স্টার-সিস্টেমের উপর হয়তো কিছু আঁচড়ও পড়বে। একটি ছোট ক্লাবের কর্মকর্তা বলছেন ঃ "উয়াড়ি আমাদের সকলের মনোবল বাড়িয়ে দিল"

ইস্টবেঙ্গল শিবিরে হতাশার ছবি। অরুণ ঘোষের এই আঠারোজন ফুটবলারের সুখী পরিবার শুরুতেই ঝড়ের মুখে পড়ল। ইস্টবেঙ্গল জনতা উয়াড়ির তরুনদের অভিনন্দন জানাতে ভোলেনি। কিন্তু তারপরই শুরু হল ভাঙচুর—যা গড়িয়েছে এস্প্লানেড পর্যন্ত। আক্রমণের লক্ষ্য হলেন কিছু কর্মকর্তা। কিছু কিছু ফুটবলারকেও খোঁজা হল। খেলার পর ইস্টবেঙ্গল টেন্টের মেঝের ওপর ভেঙে পড়া সুরজিৎ-শ্যামলদের দেখে ভাবলাম ঃ এই টীম আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেতো?

মোহনবাগান শিবির কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির ফাঁদে পা বাড়াতে রাজী নয়। সতর্কতার সুর শৈলেন মান্নার গলায় ঃ "এখনতো লীগের শুরু। দু' পয়েন্ট ইস্টবেঙ্গল হারালেও মোহনবাগানের সতর্ক থাকা উচিৎ।"

কোচ অরুণ ঘোষের ভাগ্য বড় টীমের ক্ষেত্রে যেন খুলতেই চায়না। এত খাটলেন, সমস্ত ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করলেন—অথচ শুরুতেই এই বিপর্যয়।

একটি খবর ঃ ৮ জুন মাঠে ঢোকার সময় ইস্টবেঙ্গল গেটে পুলিশ সুরজিৎকে আটকায় এবং একাধিক ফুটবলারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। আবহাওয়া তাই এমনিতেও থমথমে ছিল। গতবার ইস্টবেঙ্গল শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে খুব খারাপ খেলে হেরে যাওয়ার পরও ইস্টবেঙ্গল টেন্টে এমন বিষাদ দেখিনি।

বিশ্বকাপঃ '৩০, '৩৪ ও '৩৮

মানস বক্সী

বিশ্বকাপ ফুটবলের শুরুতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন দুজন ফরাসী। জুল রিমে এবং হেনরী ডেলনে।

১৯০৮ সালে বিশ্বকাপ পরিচালনা করার জন্য একটি সংস্থা গঠন করা হয়। নাম হয় ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন। ছোট্ট করে 'FIFA' (ফিফা)। ফিফার সভাপতি জুল রিমের নাম যুক্ত হয় বিশ্বকাপের সঙ্গে। ১৯২৮ সালে ফিফার বার্সিলোনা অধিবেশনে উরুগুয়েকে ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ আয়োজনের সম্মান দেওয়া হয়।

আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে ও বেলজিয়াম এই তেরটি দল নিয়ে প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসল ১৩ জুলাই, রবিবার, শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামে।

চারটি পুল থেকে আর্জেন্টিনা, যুগোস্লাভিয়া, উরুগুয়ে ও যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে আসার পথে আর্জেন্টিনা ফ্রান্সকে ১-০ গোলে ও মেক্সিকোকে ৩-১ গোলে হারায়। যুগোস্লাভিয়া হারায় ব্রাজিলকে ২-১ ও বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে। উরুগুয়ে পেরুকে ১-০ ও রোমানিয়াকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। যুক্তরাষ্ট্র বেলজিয়াম ও প্যারাগুয়েকে হারায় ৩-০, ৩-০ গোলে।

সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্র এবং উরুগুয়ে ও যুগোস্লাভিয়া। আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে উভয়েই ৬-১ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হল।

৩০ জুলাই ফাইনাল খেলার আসর বসে। প্রায় এক লক্ষ দর্শককে সাক্ষী রেখে উরুগুয়ে ৪-২ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে

যখন অধিনায়ক নাসাজি, ফিফা-র সভাপতি জুল রিমের হাত থেকে ৫০ হাজার ফ্রাঙ্কের সোনার পরী নিলেন তখন চারিদিকে হাজার হাজার মোটর গাড়ীর হর্ণ ও জাহাজের ভোঁ বাজছিল। ফাটছিল অসংখ্য পটকা এবং প্রত্যেকের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। বিশ্ব কাপের প্রথম আসর শেষ হবার সময় ঘোষণা করা হল ১৯৩৪ সালের আসর বসবে ইতালিতে।

১৯৩৪ সালে ইতালিতে ষোলটী দলকে নিয়ে নক্-আউট পদ্ধতিতে খেলা শুরু হল। কিন্তু উরুগুয়ে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রইল।

প্রথম রাউণ্ডে জয়ের সুবাদে ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও হাঙ্গেরি দ্বিতীয় রাউণ্ডে যায়। তারা পরাস্ত করে — যুক্তরাষ্ট্র, রোমানিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ব্রাজিল, হল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা ও মিশর এই আটটি দেশকে।



মেক্সিকোর গোলকীপার কারবাজল খেলেছেন পাঁচটি বিশ্ব কাপে।

সেমি-ফাইনালে একটিতে মুখোমুখি ইতালি অস্ট্রিয়া এবং অন্যটিতে জার্মানী - চেকোশ্লোভাকিয়া। ইতালি এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ফাইনালে যায়। কিন্তু ফাইনালে যাওয়ার পথে ইতালিকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তারা রিপ্লে ম্যাচে মিজ্জার দেওয়া অপূর্ব গোলে হারায় স্পেনকে। সেমিফাইনালে প্রচন্ড লড়াইয়ের পর অস্ট্রিয়া ০-১ গোলে হার স্বীকার করে। গোলটি করে গাইতা তিনি কর্নার থেকে ইন-সুইং করিয়ে গোল করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া অতি সহজেই ৩-১ গোলে জার্মানদের হারিয়ে দেয়। তাদের পক্ষে নেজলি দুটি এবং ক্রিসিল গোল করেন।

১০ জুন রোমে ফাইনালে ইতালি ২-১ গোলে চেক দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রথমার্ধে চেক দল ছোট ছোট পাসে খেলে ইতালিকে নাজেহাল করে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের কুড়ি মিনিটেই পাক বক্সের বাইরে থেকে প্রচণ্ড শটে গোল করে চেক দলকে এগিয়ে দেয়। এবার ইতালি খেলা ধরে নেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরসি কয়েকজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে চমৎকার ড্রপ-ভঙ্গিতে গোল করেন। খেলা ১-১। অতিরিক্ত সময়ে শিয়াভিও সহজেই চেক গোলরক্ষক প্লানিকাকে পরাস্ত করেন। তৃতীয় স্থান পায় জার্মানি।

১৯৩৬-এ বার্লিন কংগ্রেসে 'ফিফা' ফ্রান্সকে ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপের দায়িত্ব দেয়। এবার যোগ দিল পনেরটি দল। উরুগুয়ে এবং অস্ট্রিয়া প্রতিযোগিতায় যোগ দিলনা। নতুন দল কিউবা, পোল্যাণ্ড এবং ডাচ ইস্টইন্ডিজ। খেলা হল নক আউট পদ্ধতিতে।

প্রথমেই বাধা পেল সুইজারল্যান্ড, কিউবা এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। প্রথম দিন সুইজারল্যাণ্ড ১-১ গোলে জার্মানির সাথে এবং কিউবা ৩-৩ গোলে রোমানিয়ার সাথে খেলা শেষ করল। রিপ্লে ম্যাচে সুইজারল্যান্ড জয়ী হয় ৪-২ গোলে এবং কিউবা ২-১ গোলে। ইতালি অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে হারায় নরওয়েকে। ব্রাজিল ও পোল্যাণ্ডের খেলায় উপস্থিত দর্শকরা বলের গতির সঙ্গে দোদুল্যমান ছিল। প্রথমার্ধে ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়। কিন্তু নির্দিস্ট সময়ে খেলা শেষ হয় ৪-৪ গোলে। অতিরিক্ত সময়ে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। এই সময় পোল্যান্ড একটি গোল করে এগিয়ে যায়। কিন্তু ব্রাজিল পরপর দুটি গোল করে জয় ছিনিয়ে নেয়।

সুইডেন শোচনীয় ভাবে কিউবাকে ৮-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে যায়। ইতালি ২-১ গোলে ফ্রান্সকে, ব্রাজিল ২-১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে এবং হাঙ্গেরি ২-০ গোলে সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে যায়।

সেমিফাইনালে ইতালি খুব সহজে না হলেও, ২-১ গোলে ব্রাজিলকে হারায়। হাঙ্গেরি অতি সহজেই সুইডেনকে হারিয়ে দেয় ৫-১ গোলে। অবশ্য সুইডেন প্রথমে এগিয়ে ছিল। হাঙ্গেরির সেজেলার তিনটি গোল করেন।

১৯ জুন ফাইনালে হাঙ্গেরিকে ৪-২ গোলে পরাস্ত করে ইতালি পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়। ইতালি বিশ্রামের সময় ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। তাদের পক্ষে পিওলা ও কলৌসি দুটি করে এবং হাঙ্গেরি-র টিটকস ও সারোসি গোল করেন। তৃতীয় স্থান পেল ব্রাজিল।

ইতালি যোগ্য দল হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হল। তাদের মনে রঙীন আশা দেখা দিল। আর একবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেই জুল রিমে কাপ চিরতরে তাদের ঘরে এসে যাবে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। ১৯৭০-এ জুল রিমে কাপ চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে গেল ব্রাজিল।



রঞ্জিতকুমার ঘোষ

বিশ্বকাপ ফুটবলে যেন সবকিছুই রাজ-সংস্করণ। খেলোয়াড়দের 'স্কিল', গতিবেগ ও শক্তিতে, গোলের মনোহারিত্বে কিংবা গোল বাঁচানোর কৃতিত্বে এবং সামগ্রিক-ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতায় ও উৎকর্ষে প্রতিযোগিতাটি নিঃসন্দেহে অন্য যে কোনও পূর্ণাঙ্গ ও সীমাবদ্ধ আন্তর্জাতিক আসরের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তালিকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি বলপ্রয়োগের কথাটা উহ্য রাখা হয়। ফাউলের সংখ্যাধিক্যে এবং হিংস্রতার দিক থেকেও প্রতিযোগিতাটি বিশ্বশীর্ষে। বস্তুতঃ এতে যে ধরণের হিংস্র ফাউলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, এক আন্তঃ-ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকান ফুটবল ছাড়া তার জুড়ি মেলা ভার। ফুটবলের ১২ নং আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের নবরত্নের উল্লেখ করা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হতে পারে, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আইন প্রণেতারা এর অধি-কাংশই জুড়েছেন শুধু বিশ্বকাপের কথা মনে রেখে।

ফাউল করার প্রয়োজন কী, এতে খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে কিনা বাস্তবক্ষেত্রে মেরে খেলে কে কতটা লাভবান হয়েছে—এসব তর্কের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। যেমন লাভ নেই কোনও গণ্ডগোলের ম্যাচে খেলোয়াড়দের দোষের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টায়। কারণ এসব তর্কের শেষ নেই। তবুও দুটি কথা বলবো। 'প্রেমে ও যুদ্ধে 'অন্যায়' বলে কিছু থাকতে পারে না', এই তথাকথিত আপ্তবাক্যকে অনেকেই নির্দ্বিধায় ক্রীড়াঙ্গনে সম্প্রসারিত করে দিয়ে থাকেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে-কোনও খেলাতেই নিছক হারজিতের প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয়, উপায়ের বৈধতা-অবৈধতা বিচারের প্রসঙ্গটি গৌণ হয়ে যায়। আর, ফুটবল এমন একটি খেলা, যেখানে দৈহিক সংস্পর্শ অনিবার্য। সংস্পর্শকে সংঘর্ষে পরিণত করা খুবই সোজা। ঠিক এখানেই আসছে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য। সভ্যতার সহস্র অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ বহু-ক্ষেত্রেই তার আদিম জন্তুর প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠতে পারে না। বলপ্রয়োগের খেলা সেই প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র—এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয় কি?

যাক্। তত্ত্ব থেকে এবার তথ্যে আসি। এখানেও সমস্যা। কোথায় শুরু করি? মারদাঙ্গার দিক থেকে সবচেয়ে কুখ্যাত বিশ্বকাপের কোন্ খেলাটি? উত্তরে সকলে একমত হবেন না। কালানুক্রম-অনুযায়ী আলোচনা আরম্ভ করলে সে সমস্যা এড়ানো যায়, কিন্তু সে যেন ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর লেখা। কোনোটিই না করে বরং চলে যাই ১৯৬৬-তে। বিশ্বকাপের ইতিহাস জানার যে সামান্য সুযোগ পেয়েছি, তাতে মনে হয় মারপিট প্রতিবারই অল্পবিস্তর হলেও ১৯৬৬-র প্রতিযোগিতা অন্যান্য বছরকে লজ্জা দিয়েছে। প্রথমে তিন নম্বর গ্রুপের খেলায় পর্তুগাল ব্রাজিলকে প্রচণ্ড মারধোর করে। অন্যান্যদের মধ্যে আহত হন পেলে, আর খেলতে পারেননি সেবার। ক্ষোভে শপথ করে বসেন যে বিশ্বকাপে তিনি আর খেলবেন না। আশ্চর্যের বিষয় যে পেলেকে দু' দুবার মেরে ধরাশায়ী করেন তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রেফারি ম্যাককেব কোনও ব্যবস্থা নেননি। এর পর চারটি কোয়ার্টার ফাইনালের দুটিতে মার-পিট হয়। ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ড-আর্জেন্টিনার উত্তপ্ত আবহাওয়ার খেলায় রেফারির সঙ্গে তর্ক করায় বেরিয়ে যেতে হয় আর্জেন্টিনার দীর্ঘদেহী অধিনায়ক অ্যান্টনিও র‍্যাটিনকে। দশ জনে খেলে এক গোলে হারার পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা আক্রমণ করেন রেফারি ক্রিটলিনকে, চড়াও হলেন ইংলণ্ডের ড্রেসিং রুমে। স্টেডিয়ামের এখানে-সেখানে দাঙ্গা চলল। সাংবাদিক সম্মেলনে ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার র‍্যামসে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়-দের 'জানোয়ার' বললেন, যার জের অনেক-দিন চলেছিল। অপরদিকে শেফিল্ডে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে দৃশ্যতঃ ন্যায্য একটি পেনাল্টি কিক থেকে বঞ্চিত হয়ে উরুগুয়ে মাথা গরম করে খেলতে থাকে। এই আগুনে ঘি ঢালে জার্মানীর ফাউল।

এমেরিন উরুগুয়ের অধিনায়ক ট্রোশেকে প্ররোচিত করেন, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ট্রোশেকে বেরিয়ে যেতে হয়। যাবার পথে তিনি জার্মানীর জিলারকে একটি চড় মারতে ভোলেননি। বেরিয়ে যেতে হয় উরুগুয়ের সিলভানকেও। ন'জনের দলের বিরুদ্ধে জার্মানী সহজেই তিন গোল করে মোট চার গোলে জিতল। সেইরকম, সেমিফাইনালেও জার্মানীর বিরুদ্ধে ন'জন নিয়ে খেলতে হয় প্রতিপক্ষ রাশিয়াকে। বেকেনবাউয়ার-কে মারতে গিয়ে নিজেই আহত হয়ে বেরিয়ে যান সাবো আর সেলিঙ্গার-এর কাছে মার খেয়ে চিমলেন্স্কো হেল্ডকে লাথি মেরে শোধ নিতে গিয়ে বহিস্কৃত হলেন। হারলেও (১-২) ন' জনে সেদিন রাশিয়া দারুণ লড়েছিল।

১৯৫৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন-এ ব্রাজিল ও হাঙ্গেরীর কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠের মধ্যে ও বাইরে এমন বিশ্রী মারপিট হয় যে খেলাটি বিশ্বফুটবলের ইতিহাসে 'বার্ন-এর যুদ্ধ' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। ম্যাচকে আয়ত্তে রাখতে স্বনামধন্য আর্থার এলিস বার করে দেন ব্রাজিলের নিলটন স্যানটোস ও হাঙ্গার্টো টোজি-কে এবং হাঙ্গেরীর জোসেফ বসজিক-কে। বসজিক ও নিলটন স্যাণ্টোস ঘুষোঘুষি করেছিলেন, হাম্বার্টো লাথি মেরে ছিলেন লোরাণ্ট-কে। ব্যাপারটির এখানেই শেষ হয়নি। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা হাঙ্গেরীর ড্রেসিং-রুম অবধি ধাওয়া করে এবং অনেক অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা হয়। ক্ষতবিক্ষত হয় ব্রাজিলের পিনহিরো-র মুখ। তাঁকে নাকি বোতল ছুড়ে মেরেছিলেন পুসকাস—যে পুসকাস স্বয়ং আহত হয়েছিলেন আগে জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলায় এবং টাচলাইনের ধারে বসে খেলা দেখছিলেন। অনেকেই বলেন, সেদিনের ড্রেসিং রুমের দাঙ্গার মূলে ছিল পুসকাস-এর ব্যবহার।

পুসকাস আহত হয়েছিলেন জার্মানীর সেন্টার হাফ ওয়ের্ণার লিওব্রিচ-এর লাথিতে। পরিহাসছলে কেউ কেউ বলে থাকেন, "১৯৫৪-তে বিশ্বকাপ জিতেছিল কোন কিকটি ?—লিয়োব্রিচ এর যে লাথিতে পুসকাস খোড়া হয়েছিলেন সেটি।" পুসকাস বলেছিলেন লাথিটা ইচ্ছা করেই মারা হয়েছিল। যা-ই হোক, আহত অবস্থাতেও মাঠের বাইরে তিনি মারপিট করতে গিয়েছিলেন—এটাই বড় কথা

ব্রাজিল আরও একটি মারপিটের খেলায় জড়িত ছিল ১৯৩৮-এ ফ্রান্সের বোরদেও-তে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। ব্রাজিল-এর জেজে-এর লাথিতে কুশলী চেক লেফ্‌ট-ইন নেজলির পা ভাঙল। হাত ভাঙল প্লানিকার আর কোস্টালেক পেলেন পেটে আঘাত। ব্রাজিলের তরফে আহত হলেন পেরামিও, লিওনিডাস। রেফারি মাঠ থেকে বার করে দিলেন জেজে এবং ম্যাকাডো-কে আর চেকোশ্লোভাকিয়ার রাইট আউট রিহা-কে। যুদ্ধ ড্রেসিং রুমে না গড়ালেও বার্ণ এর যুদ্ধের চাইতে এটাই বা কম কিসে ?

এর আগেরবার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় নিজের মাঠে স্পেনের বিরুদ্ধে মারপিট করে ইতালি। স্পেনের প্রবীণ গোলকীপার জামোরা সুদীর্ঘ ১৪ বছর আগে অলিম্পিক খেললেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ম্যাচটিতে। বারবার ইতালির ফরোয়ার্ডরা তাঁকে মারতে থাকলেও তিনি ম্যাচটি অমীমাংসিত রাখতে (১—১) সক্ষম হন। দুর্বল সুইস রেফারি কোনও ব্যবস্থা নেননি—তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল তাঁর দেশের ফেডারেশন— সাসপেণ্ড করে। এই খেলায় কী পরিমাণ মারপিট হয়েছিল তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে রিপ্লেতে স্পেনের জামোরা-সমেত সাত জন আর ইতালির চারজন খেলতে পারেননি।

নিজের দেশে খেলায় সুবিধা অনেক। তাই ১৯৬২-তে চিলিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় ঐ ইতালিকে প্রচণ্ড মার দিল চিলি। চিলির লেফট ইন স্যানচেজ-এর চোরা ঘুষিতে ইতালির ম্যাসিও-র নাক ভাঙলো। প্ররোচিত হয়ে ইতালির ফেরিনি মারলেন লাণ্ডাকে আর স্যানচেজ-এর মাথায় লাথি কষালেন ডেভিড। এদের মার রেফারি দেখতে পেলেন বলেই মাঠ থেকে বেরুতে হল এদের। ন'জন নিয়ে লড়ে খেললেও শেষ পর্যন্ত ইতালি পারল না (০—২)। ১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানার বিরুদ্ধে মারপিট করতে গিয়ে চিলির দু'জনকে বেরিয়ে যেতে হয়। একজন আহত হয়ে, অপরজন রেফারির নির্দেশে। এর থেকে বোঝা যাবে সেই চিরন্তন সত্য দুটি—মারতে গেলে মার খেতেও হয় এবং সব সময় মেরে ম্যাচ জেতা যায় না।

চিলিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডের আর এক খেলায় পশ্চিম জার্মানীর জিমানিয়াক সুইজারল্যাণ্ডের ফরোয়ার্ড নবার্ট অ্যালমানের পা ভেঙে দেন। আবার পশ্চিম জার্মানীর বেকেনবাউয়ার মার খান ১৯৭০-এ মেক্সিকোতে ইতালির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে একটি হাত অকেজো হবার যোগাড় হলেও, বেকেনবাউয়ার সাহসের সঙ্গে আহত হাতটি গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে খেলা চালিয়ে যান। দেখা যাচ্ছে প্রতিভাকে অকর্মণ্য করার চেষ্টায় বিশ্বকাপে ত্রুটি হয়নি কারও। পেলে, পুসকাস, বেকেনবাউয়ার—কাউকেই খাতির করা হয়নি। শুধু বেঁচে গেছেন অনেকের টার্গেট জোহান ক্রুইফ। অবশ্য ক্রুইফ রক্ষা পেলেও ১৯৭৪-এ হল্যাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলের কাছে মার খেয়ে। রেনসেনব্রিঙ্ক দু'দলের কাছেই মার খান। ফাইনালে তিনি স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি। নিসকেন্স-এর হাঁটুতে মারেন ব্রাজিলের লুই পেয়েরা। পেরেরাকে বার করে দেওয়া হয়। ব্রাজিলের অন্যান্য কয়েকজনও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মেরে খেলার জন্যে

সতর্কিত হন। ফাইনালে ক্রুইফই আবার জার্মান গোলকীপারের বিরুদ্ধে জঘন্য চার্জ করতে উদ্যত হন ও রেফারির সঙ্গে সেই নিয়ে তর্ক করায় তাকে হলুদ কার্ড দেখান হয়।

আসলে বিশ্বকাপ ফুটবলে মারপিটের সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। ১৯৩০ আর ১৯৭৪-এ তফাৎ নেই। থাকলেও তা পরিমাণগত, গুণগত নয়। ১৯৩০-এ আর্জেণ্টিনার কুখ্যাত মারকুটে প্রেয়ার মণ্টি-র সঙ্গে সজ্ঘর্ষে ফ্রান্সের ম্যাসিনট খোঁড়া হন, আহত হন ল্যাঙ্গিলার-ও। পরের খেলায় মণ্টির লাথি পত্রপাঠ ফিরিয়ে দেন মেক্সিকোর টোরে, তারপর যাকে বলে 'ফ্রী-ফর-অল'। আর এই মেক্সিকোর বিরুদ্ধেই চোয়ালে লাথি খেয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন ফ্রান্সের গোলকীপার অ্যালেক্স থেপট। সেটাই ছিল প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার প্রথম খেলা।

ব্যাপারটি কাকতালীয় কিনা জানি না, তবে বিশ্বকাপের ঐ উদ্বোধনী খেলার তারিখ ছিল জুলাই-এর ১৩॥



এই অবস্থায়

মতি নন্দী

দুটি কথা প্রায়ই আমাকে শুনতে হয়—"পাবলিসিটি দিয়ে, কাগজে নাম ছাপিয়ে যদি উৎসাহ না দেন তাহলে…" ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং, "কী করব বলুন, ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু গভর্ণমেন্ট যদি না হেলপ করে তাহলে—"।

নানান খেলার উদ্যোক্তা, সংগঠক, কর্মকর্তাদের এমন কি খেলোয়াড়দের মুখ থেকেও এই ধরণের কথা বেরোয়। কাগজে নাম-ছবি না ছাপালে বা সরকার ভিক্ষা না দিলে যদি খেলার চেষ্টা বন্ধ হয় তাহলে বন্ধ হওয়াই উচিৎ। কেননা খেলা বা যে কোনো ধরণের শরীর সঞ্চালন মানুষ আপন তাগিদেই করে। এই তাগিদটা আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু সেটা তৈরি করে দেওয়া দরকার। এবং এটাই এখন আমাদের কাছে প্রথম এবং জরুরী কাজ। একটা মৃদু, ব্যাপক আন্দোলন দ্বারা এই তাগিদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা যায় কীভাবে, সেটাই ভেবে দেখা দরকার।

আমাদের গত ষাট-সত্তর বছরের খেলার অবস্থা লক্ষ্য করেই এ ধারণা হয়েছে যে, আমাদের মানসিকতায় খেলার গুরুত্ব অনুপস্থিত। লক্ষ্য করুন আমাদের প্রাত্যহিক জীবন কীভাবে কাটে। আমাদের শিল্পে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে—অর্থাৎ সংস্কৃতিতে খেলার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এমনকি রন্ধনে, আহারে, শয়নের সময়ের মধ্যেও বাছবিচার, শৃঙ্খলা নেই। এগুলো দীর্ঘকাল ধরেই হয়ে আসছে। ফলে পুরুষানুক্রমে ঢিলেমিও চলে আসছে। খেলোয়াড় হবার জনাই নয়, সুস্থ সবল হয়ে জীবনযাপনের জন্য যতটুকু শারীরিক ক্রিয়া দরকার, শতকরা একজনও তা করেন না। ভিৎ চওড়া না হলে বাড়ি উঁচু করা যায় না। যত বেশী ছেলেমেয়ে খেলতে শুরু করবে ততই আমরা উঁচু মানের খেলোয়াড় পাব। আমাদের মত গরীব দেশে কম জায়গা নিয়ে এবং সস্তায় সম্ভব এমন খেলা—কাবাডি, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার, ওয়াটার পোলো প্রভৃতি ধরণের খেলার প্রসার দরকার শরীরকে নাড়াচাড়া করাবার জন্য।

প্রশ্ন আসে খেলবে কোথায়? খেলার জিনিস কোথায়? কিন্তু এর জন্য সরকারকে দায়ী করার আগে খোঁজ নিন, সরকার যারা চালায় তারা এল কোথা থেকে। আপনি আমি যে সমাজে আছি, মন্ত্রীরাও সেখান থেকেই এসেছেন। আমাদের সমাজে খেলার তাগিদ থাকলে মাঠ, পুল, জিমন্যাসিয়াম এবং ট্রাক নিশ্চয়ই থাকত। পৌর প্রতিষ্ঠান বা সরকার ভোট হারাবার ভয়ে ব্যস্ত হয়েই এগুলি তৈরি করে দিত। কিন্তু আমরা খেলা সম্পর্কে উদাসীন, তাই গালভরা প্রতিশ্রুতি বা ধাপ্পা দিয়ে ওরা আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। একজন চ্যাম্পিয়ন বা কোচ, শুধুমাত্র ট্রেনিং বা আহারের দ্বারা তৈরি হয় না। তার মানসিকতা চারপাশের ঘটনা আবহাওয়ার দ্বারা গঠিত হয়। সে যদি শুধু বিশৃঙ্খলা, অশিক্ষা, দুর্নীতি, দারিদ্র এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছু দেখতে না পায়, তাহলে যতই মদৎ দেওয়া হোক, একটা পর্যায়ে গিয়ে সে আটকে যাবেই। শরীর এবং মন দুটিরই সমান্তরাল অগ্রগতি দরকার। আমাদের দেশে কোনটিই এগোচ্ছেনা। একটি চ্যাম্পিয়ন তৈরি করতে হলে দশ হাজার লোককে নিত্য ব্যায়াম বা খেলা করতেই হবে।

অদ্ভুত, অবাস্তব অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা যথাসাধ্য খেলার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং জাতীয় পর্যায়ে সফল হচ্ছে। ভাবলে, তখন ওদের প্রতি শ্রদ্ধা আসে



পেলেকে নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে।

চিরশ্রেষ্ঠ ভেঙ্কটেশ

অমল দত্ত

সব ধরনের চিত্তবিনোদকের জীবনেই মৃত্যু ঘটে কমপক্ষে দু'বার।

অগণিত গুণমুগ্ধ দর্শকের বাহবা আর হাততালির ভিতর বুঁদ হয়ে খেলা দেখাতে দেখাতে পাদ-প্রদীপের আলো থেকে চিরতরে অন্ধকারে সরে যাবার যেদিন ডাক আসে— তখন সে মৃত্যুর হিমশীতলতাকে উপলব্ধি করে।

দ্বিতীয় মৃত্যু আসে তার চলমান হৃদ্‌পিণ্ডের স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষণমুহূর্তে। উভয় মৃত্যুর ভেতর কোনটা অপেক্ষাকৃত সহনীয়, সে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা যদিও কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় — তবু ফুটবলার হিসেবে প্রথম মৃত্যুর স্বাদ আমি জানি। আর এও জানি, মৃত্যু—জীবনেরই পরিপূরক।

অন্য সব চিত্তবিনোদকদের তুলনায় ফুট-বলারদের ফুটবল-জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। তিরিশেই তার পরিসমাপ্তি। তারপর হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলের যাই-যাই আলোর মতই চলে তার ছায়ার সঙ্গে দীর্ঘায়িত স্মৃতি রোমন্থন।

ভেঙ্কটেশের মৃত্যুর খবরটা যখন খবরের কাগজের পাতায় পড়লাম, তখন মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেও, ভাবলাম—ফুটবলার ভেঙ্কটেশের মৃত্যুতো অনেকদিন আগেই ঘটে গিয়েছে। আমরা তাকে অনেকদিন আগেই নির্মমভাবে স্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছি, তাহলে আর শোকে মূহ্যমান হয়ে লাভটা কি ?

তবে হ্যাঁ একান্নতে ফুরিয়ে না গিয়ে আর সকলের মত আরও দশ-পনেরো বছর তার বাঁচা উচিত ছিল—বিশেষ করে তার স্ত্রী-পুত্রদের সুখী করতে।

কিন্তু পরের দিনের খবরের কাগজ আমার পূর্ব ধারণাকে ভেঙে খান্‌খান্‌ করে দিল।

শুকনো বালিয়াড়িতেও যেমন অন্তঃ সলিলা নদী প্রবহমান থাকতে পারে, তেমনি কে জানত এ্যাস্‌ফাল্ট আর পিচমোড়া এই হৃদয়হীন কলকাতার উদাস ক্রীড়ামোদীদের মনেও ভেঙ্ক-টেশের জন্য এত কান্না জমা হয়ে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিলকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তারা ভারতের চিরকালের প্রথম সারির এই ফুটবলারটির শোক-সন্তপ্ত অভাবে বিধ্বস্ত



পদ্মোত্তম ভেঙ্কটেশ।

পরিবারটির জন্য মাত্র দু' হাজার টাকা অনুদান দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি শুধু এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সরকারের কাছে আজ একটা প্রশ্নই তুলব —গত ১৯৬৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গড়ের মাঠের ফুটবল থেকে প্রতি বছর নীট মুনাফা লুটেছেন কমপক্ষে ৪।৫ লক্ষ টাকা করে। অর্থাৎ ১৫ বছরে ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা। অথচ এই টাকা থেকে তারা কত টাকা খরচ করেছেন সেইসব ফুটবলারদের জন্য যাদের রক্তঝরান ঘামে গড়ে উঠেছে এই টাকার পাহাড় ?

আর্থিক অনটন হয়ত ভেঙ্কটেশের পরিবার আজ না হয় কাল একদিন কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের পরের জেনারেশনের ক্রীড়া-মোদীরা যে খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশকে হারালো তার কি হবে ?

তাহলে ব্যাপারটা একটু খুলেই বলতে হয়। আমরা ফুটবল খেলছি একশো বছরের কাছা-কাছি। এই বিরাট সময় - সীমার ভিতরে বহু প্রতিভাধর অনন্যসাধারণ ফুটবলার এই ভারতের মাটিতে ফুটবল খেলেছেন যাদের শুধু নামটুকুই আছে। কিন্তু তাদের ক্রীড়াভঙ্গী, বৈশিষ্ট্য রেকর্ড এবং কেন তারা অনন্য তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি — যার মাধ্যমে সেই খেলোয়াড় অমর হয়ে থাকবেন ক্রীড়ানুরাগীদের মনে।

গত বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর বিজ্ঞান আমাদের যে সুযোগ দিয়েছিল তা আমরা নিইনি। আমরা ধরে রাখিনি কোনো প্রতিভাবান ফুটবলারের খেলাকে সেলুলয়েডে।

কিন্তু একটা খেলা অন্তত আমি জানি যার পুরোটাই ধরে রাখা হয়েছে সেলুলয়েডে। ভারত সরকার এবং আই এফ এ যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে আগামী দিনের ফুটবল অনু-রাগীরা অন্তত ভেঙ্কটেশের ক্রীড়া-প্রতিভার পরিচয় পেতে সক্ষম হবেন।

১৯৫৩ সালে আমরা বুখারেস্টে যুব-উৎসব সেরে রাশিয়ায় চলেছি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে।

প্রথম খেলা কার সঙ্গে খেলব হোটেল থেকে যখন স্টেডিয়ামের দিকে বেরোচ্ছি তখনও জানতাম না। মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামের দরজায় পৌঁছে শুনলাম আমরা খেলছি ওখানকার লীগ চ্যাম্পিয়ন টীম টর্পেডোর বিপক্ষে।

প্রথমার্ধে আমরা দু'গোলে পিছিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে ভেঙ্কটেশ ফ্রি কিক থেকে বাঁ পায়ের অসাধারণ শটে গোলকীপারকে দাঁড় করিয়ে একটা গোল শোধ করল। ওরা আবার একটা গোল করল। খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে সেন্টার ফরোয়ার্ড থঙ্গরাজ একটা গোল শোধ করাতে আমরা আবার আশার আলো দেখতে পেলাম। এবং শেষের পাঁচ মিনিট ভেঙ্কটেশ আগুন হয়ে উঠল। ওর যে ৮/৯ ধরণের ডজ্‌ ছিল তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করে বিপক্ষের ডিফেন্সকে ছিন্নভিন্ন করে বাঁ পায়ের তীব্র শটে তৃতীয় গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনল।

সেদিন বিদেশের মাটিতে এক লক্ষ ভিন দেশী সমর্থকদের সামনে এতটুকু দমে না গিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানতালে লড়বার যে মানসিক দৃঢ়তা ভেঙ্কটেশ দেখিয়েছিল তা কোনোদিন ভুলব না।

একবার এক সাংবাদিক আমায় প্রশ্ন করে-ছিলেন — এদেশে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড কে ? সেদিন আমি তার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারি — ভেঙ্কটেশ।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কেন ? উত্তরে জানাই — ভেঙ্কটেশের আগে পর্যন্ত এদেশে উইঙ্গারের খেলা ছিল কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে পৌঁছে মাপা সেন্টার করা। কিন্তু সেই প্রথাকে প্রথমে ভাঙে সালে। এবং তাকে আরও সার্থকভাবে রূপ দেয় ভেঙ্কটেশ।

কিন্তু কেবলমাত্র উইঙ্গার হিসেবেই তো ভেঙ্ক-টেশকে দেখছি না — দেখছি ফরোয়ার্ড রূপে।

প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে একমাত্র সৃজন-শীলতার নিত্য-নতুন কৌশলই ফরোয়ার্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। সে অতীতেও যা ছিল আজও তাই আছে। এবং এ বিষয়ে মাত্র ২।৩টি ভ্যারিয়েশন (কৌশল) থাকলেই যেকোনো ফরোয়ার্ড এদেশে সার্থকনামা হয়ে ওঠে। সেই

খানে ভেঙ্কটেশের ছিল ৮৯টি। এবং সবগুলিই ও অবলীলাক্রমে সর্বত্র প্রয়োগ করতে পারত।

যেহেতু রাইট আউট খেলত ভেঙ্কটেশ, বিপক্ষের ডিফেণ্ডাররা স্বভাবতই ওর ডান পায়ের দিকেই নজর দিত বেশী। সেই কারণে ভেঙ্কটেশ ওর বাঁ পায়ের শুটিং-এ একটা অসাধারণ পূর্ণাঙ্গতা এনেছিল যা দিয়ে বারবার বিপক্ষের গোলকীপারকে পরাস্ত করত। এবং কেবলমাত্র এই শটটিকেই ও প্রতিদিন ঘন্টা-খানেক একাকী অনুশীলন করত।

ওর সঙ্গে শেষ দেখা গত বছর শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে। আমি আমার স্কুটারে, — ও ওর মোটর বাইকে। টালা ব্রীজ পেরিয়ে চিড়িয়া মোড়ের কাছে এসে ও বেঁকে যাবে দমদম — আমি যাব ডানলপ।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে ভেঙ্কটেশ বলল — সুরজিৎকে বোলো ও খুব বড় রাইট আউট হবে তবে বাঁ পাটার দিকে যেন আরও নজর দেয়।

আমি হেসে বললাম — তুমি বললেও তো পার? ও লাজুক হাসি হেসে বলল — ধ্যেৎ।

ওর সেই লাজুক হাসিটাই আমার মনে অক্ষয় হয়ে রইল।



ভেঙ্কটেশের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে প্র্যাকটিসের আগে মৌনতা পালন করছে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা।

বিশ্বকাপঃ '৫০ ও '৫৪

সুপ্রিয় সেন

১৯৩৮-এর পর যুদ্ধের ডামাডোলে ফুটবল মাথায় উঠলো বারো বছর। ১৯৫০-এ আবার যবনিকা উঠলো। কোথায় আর, ফুটবল যাদের স্বপ্ন, যে দেশে জন্মেছেন ফুটবলের রাজা, সেই ব্রাজিলে।

সেবার খেলতে এসেছিলো মোট তেরটি দল। স্কটল্যাণ্ড এলোনা এক অদ্ভুত জেদের ফলে। ওয়ার্ল্ড কাপের নিয়ম অনুযায়ী বৃটিশ ইন্টার ন্যাশনালের চ্যাম্পিয়ন আর রাণার্স দু দলেরই আসার কথা। কিন্তু স্কটিশ এ্যাসোসিয়েশন আগেই বলে বসলো, চ্যাম্পিয়ন না হ'লে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে যাবই না। গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্কে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওদের



পুসকাস

খেলা ড্র হ'লেও স্কটল্যাণ্ডই হবে চ্যাম্পিয়ন। এমনই দৈব যে একমাত্র গোলে হেরে তারা রাণার্স হ'য়ে গেল। ব্যাস্, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, এলোনা স্কটল্যাণ্ড। তখন পর্তুগালকে বলা হোল আসতে। টীম সুবিধের নয়, খরচও অনেক। অতএব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো তারাও। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি আর চেকোশ্লোভাকিয়াও এলোনা। ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, বড্ড বেশী দূর।

১৩টি দলকে ভাগ করা হোল চারটি পুলে।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুল থেকে উঠল ব্রাজিল আর সুইডেন।

১৯৩০-এ চ্যাম্পিয়ন হবার পর ২০ বছর বাদে উরুগুয়ে আবার এলো ওয়ার্ল্ড কাপে। চতুর্থ পুলে আর একটি দল, বলিভিয়া। হাসতে হাসতে আট গোল দিয়ে রেকর্ড করলো উরুগুয়ে।

এবার ফাইন্যাল পর্য্যায়—লীগ প্রথায় চার দলের মধ্যে।

প্রচণ্ড ফেবারিট ব্রাজিল, স্বভাবতঃই। মারাকানায় সুইডেনের সঙ্গে রাজার মতো খেললো ব্রাজিল। দর্শকরা পাগল হ'য়ে গেল খেলা দেখে। ৭-১ গোলে জিতলো ব্রাজিল। আদেমীর একা দিলেন চার গোল।

অবশিষ্ট অংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফুটবল খেলার নিয়ম ও আইন

রেফারী



কেন অ্যাস্টন

ফুটবল আইনের ধারা এ সংখ্যাতেও শুরু করছি না। কারণ 'খেলার কথা'র এটি বিশ্ব ফুটবলের বিশেষ সংখ্যা। সুতরাং বিশ্ব ফুটবলে রেফারিং নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

রেফারীর পরিচালনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ফুটবলে অনেক ঘটনাই ঘটেছে, পক্ষপাতদুষ্ট পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে, খেলা সাময়িক বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বড় রকমের দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি। তার কারণ বোধহয় পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য ফিফার রেফারীজ কমিটি যে রেফারীদের নিয়োগ করেন তারা শুধু অসাধারণ দক্ষই নন, উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে খুবই পটু। রেফারীদের ক্ষেত্রে এই গুণ অপরিহার্য।

বিশ্ববিখ্যাত রেফারী আর্থার এলিস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন — "সদা অসন্তুষ্ট এক বদমেজাজী খেলোয়াড়কে তিনি বাগে আনতে পারছিলেন না। প্রতিনিয়তই এটা-ওটা নিয়ে খেলোয়াড়টি প্রশ্ন তুলছিল। তিনি ওই খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দিতে পারতেন, কিংবা পারতেন মাঠ থেকেও বের করে দিতে। কিন্তু ও সব না করে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। খেলোয়াড়টি দ্বিতীয়বার সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করতেই তিনি খেলোয়াড়টির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন — "হায় হায়! কী করলে? এমন সহজ সুযোগ থেকেও গোল করতে পারলে না? আমিও তো গোল করতে পারতাম।" ওষুধে কাজ হল। খেলোয়াড়টি বোধ হয় লজ্জা পেয়ে গেল। আর একবারও পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তুলল না।

আইন অনুযায়ী রেফারী তো সব সময়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু আইনের আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে এই ধরণের রসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধিতে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালের কথা বলা যাক। আর্জেন্টিনা দাবী জানাল তাদের দেশে তৈরি বলে তারা খেলবে —অন্য বলে খেলবে না। উরুগুয়ের ম্যানেজার রেফারীকে বললেন—"আর্জেন্টিনায় তৈরি বলে তুমি উরুগুয়েকে খেলতে বাধ্য করতে পার না।"

রেফারী জন ল্যাঙ্গেনাস দু পক্ষের বক্তব্য শুনে দুটি বল নিয়ে মাঠে উপস্থিত হলেন।

একটি আর্জেন্টিনায় তৈরি আর একটি উরুগুয়েতে তৈরি। তারপর ঠিক করলেন টসে যারা জিতবে তাদের বলে প্রথমার্ধ খেলা হবে, দ্বিতীয়ার্ধ খেলা হবে অপর বলে। কোন পক্ষেরই আর কিছু বলার রইল না। প্রথমার্ধ খেলা হয়েছিল আর্জেন্টিনার বলে এবং বিরতি সময়ে আর্জেন্টিনা ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল। উরুগুয়ে দ্বিতীয়ার্ধে তাদের বলে আরও তিনটি গোল করে ৪—২ গোলে জিতে প্রথম বিশ্বকাপ পেল।

কোন্ বলে খেলা হবে আইন অনুযায়ী তা ঠিক করার এক্তিয়ার রেফারীর। এবার অবশ্য আর্জেন্টিনায় খেলা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ার্লড কাপ বলে। ১৯৩০ সালের ফাইন্যালে রেফারী ল্যাঙ্গেনাস তার পছন্দমত একটি বল বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে উপস্থিত বুদ্ধিতে দুই দলকেই সন্তুষ্ট করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বকাপেই প্রথম রাউণ্ডে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের খেলাটি এক রেফারী সময় গননার ভুলে ৬ মিনিট কম খেলিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনা ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। ফ্রান্স কিন্তু দারুণ খেলছিল। মনে হচ্ছিল যে কোন সময় গোল শোধ হয়ে যাবে। ল্যাঙ্গেনার সব বাধা কাটিয়ে গোল করতে যাচ্ছে তখনই রেফারী লম্বা বাঁশী বাজালেন। কী ব্যাপার? অফসাইড না ফাউল? কিছুই না। খেলার শেষ বাঁশী। দেখা গেল তখনো ৬ মিনিট বাকী। ফ্রান্স প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ৮৪ মিনিটে খেলা শেষ করা হয়েছে। সুতরাং অসমাপ্ত খেলা। গোলমালের মধ্যে ১৫ মিনিট কেটে গেল। তারপর বাকী ৬ মিনিট খেলানো হল। ফল কিন্তু একই রইল। ফ্রান্স এই ঘটনায় খুশি হতে পারেনি। তাদের বক্তব্য ছিল: আমরা গোল শোধ করে দিতে পারতাম। রেফারী আমাদের মানসিক ধৈর্য্য নষ্ট করে দিয়েছেন।

কথাটা উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। রেফারীর হয়তো সত্যিই সময় গণনায় ভুল হয়েছিল। কিন্তু বাকী সময়টুকু খেলিয়ে তিনি নিয়ম মাফিক কাজই করেছিলেন। এখনোওই নিয়মই বলবৎ আছে। যদি ভুল করে কম সময় খেলানো হয় তবে সময় হাতে থাকলে বাকী সময়টুকু খেলানো যায়।

আমাদের ভারতে এখন বুট পরে খেলা বাধ্যতামূলক। বুট পরেই খেলতে হবে—আন্তর্জাতিক আইনে কিন্তু এমন বিধান নেই। তবে আন্তর্জাতিক রেফারী এ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের পরামর্শ: প্রতিযোগিতার খেলায় যখন প্রায় সমস্ত খেলোয়াড় বুট পরে খেলে তখন একজন বা দুইজন খেলোয়াড়কে খালি পায়ে খেলতে দেওয়া উচিত নয়। ১৯৩৮-এ তৃতীয় বিশ্বকাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের অসাধারণ খেলোয়াড় লিওনিদাস ডা সিলভা এক পা খালি এবং এক পায়ে বুট নিয়ে গোল করেছিলেন পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। কারণ জলকাদার মাঠে তার এক পায়ের বুট কাদায় আটকে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই লিওনিদাসই দক্ষিণ আমেরিকাতে ফুটবলে প্রথম সোরগোল তোলেন। দারুণ ফরোয়ার্ড ছিলেন। ওরই নাম ছিল 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড'। তাই পরবর্তীকালে পেলের নাম হয় 'ব্ল্যাক পার্ল'।

ব্রাজিল হয়তো ওই বছরই বিশ্বকাপ জিতত, যদি ইতালির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে লিওনিদাস ও আর এক অসাধারণ খেলোয়াড় টিমকে বসিয়ে রাখা না হত। ব্রাজিলের ম্যানেজার পিমেণ্টা ভেবেছিলেন তাঁর দল ইতালির বিরুদ্ধে সহজেই জিতবে। ফাইনালে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হাঙ্গেরীর সঙ্গে খেলার জন্য ওই দুজন খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। ব্রাজিল ইতালির কাছে হেরেছিল কিন্তু এক সন্দেহজনক পেনাল্টি গোলে। ব্রাজিলের গোলের মুখে ইতালির খেলোয়াড় পিওলা ভান করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পিওলাই উঠে দাঁড়িয়ে পেনাল্টি কিকে গোল করেন। ওই গোলেই ইতালি যায় ফাইনালে এবং শেষ পর্যন্ত হাঙ্গেরিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে। ব্রাজিলের দূতাবাস থেকে সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল রেফারীর পরিচালনার বিরুদ্ধে।

যদি সত্যিই রেফারী ভুল করে থাকেন বা ইচ্ছে করে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে কতবড় অন্যায় করেছিলেন সহজেই অনুমেয়। ব্রাজিল হয়তো ওই ১৯৩৮ সালেই জুলে রিমে ট্রফি জিততো, জয়ের জন্য ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতনা।

রেফারীর পরিচালনার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য দুইই জড়িয়ে আছে। আমরা জানি ১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের একটি গোল নিয়ে বিতর্কের সোরগোল উঠেছিল। অনেকেরই অভিমত, বল গোল লাইন অতিক্রম না করা সত্ত্বেও রেফারী ইংল্যাণ্ডের সপক্ষে গোলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড অবশ্য জিতেছিল অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ৪—২ গোলে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ওই গোলটি না পেলে ইংল্যাণ্ড ফাইনালে হেরে যেত। ইংরেজদের তোলা বিশ্বকাপের ফিল্মে অবশ্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে — বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে। কিন্তু ফিল্মের ছবি কি সবকিছু প্রমাণ করে? যে বল গোলে ঢোকেনি গোল লাইন থেকে এক ফুট দূরে আছে সেই বলকেও ছবিতে দেখানো যায় জালের সঙ্গে লেপটে আছে।

যাই হোক ১৯৬৬ সালের ঘটনা যদি ইংল্যাণ্ডের সৌভাগ্যের পরিচায়ক হয় তবে ১৯৫০-এর ঘটনা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। দুর্ভাগ্য তো বটেই, না হলে কি প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে গিয়ে ফুটবলে অখ্যাত আমেরিকার কাছে প্রথম খেলায় হার স্বীকার করে? দ্বিতীয় খেলায় স্পেনের কাছে হারে রেফারীর ভুলে। ইংল্যাণ্ডের

মিলবার্গ যে গোলটি করেছিলেন রেফারী অফসাইডের অজুহাতে তা নাকচ করে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে গোলটি নাকি ছিল হক গোল।

১৯৫৪ সালে জুরিখে পঞ্চম বিশ্বকাপ ফাইনালে কী হয়েছিল? ৫২ মাসের মধ্যে অপরাজেয় ফেরেঙ্ক পুসকাসের দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরী দল অপ্রত্যাশিতভাবে ২—৩ গোলে হেরে গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীর কাছে। তাও হাঙ্গেরী ২—০ গোলে এগিয়ে থাকার পর। হাঙ্গেরীর দুটি গোলের একটি গোল করেছিলেন পুসকাস। তার আর একটি গোল রেফারী নাকচ করে দিয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে পুসকাস লিখেছেন — "তথ্যচিত্র সাক্ষী, টেলিভিসন সাক্ষী, মাঠের ৭০ হাজার দর্শক সাক্ষী—আমার ওই গোলটি অফসাইড ছিল না।"

রেফারীরা আগে তো খেলোয়াড়দের মুখেই সতর্ক করে দিতেন। মার্চিং অর্ডারও দিতেন মুখের আদেশে। ইয়েলো কার্ড এবং রেড কার্ড ব্যবহার এল কী ভাবে? বিশ্বকাপের খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। ১৯৬৬-র প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার অধিনায়ক রেটিনকে রেফারী মার্চিং অর্ডার দিয়েছিলেন রেটিনের স্প্যানিশ ভাষা বুঝতে না পেরে। রেফারী ধরে নিয়েছিলেন রেটিন তাঁকে গালাগালি করেছে। আসলে কিন্তু গালাগালি করেনি। বহু খেলায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খেলায় এক দেশের রেফারী অন্য দেশের খেলোয়াড়ের ভাষা না বোঝায় এই ধরণের বিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে। রেফারী কী বলছেন খেলোয়াড়েরা অনেক সময় তা বুঝতে পারে না। কিন্তু কার্ড দেখালেই খেলোয়াড় বুঝতে পারে রেফারী কী বলছেন। মুখের কথার চেয়ে কার্ড দেখালে মনের ওপর একটা চাপও সৃষ্টি হয়। তাই সর্বত্রই এখন হলুদ কার্ড ও লাল কার্ড ব্যবহার চালু হয়ে গেছে।

খেলোয়াড়কে মার্চিং অর্ডার দেবার পর ওই খেলোয়াড় যদি মাঠ থেকে বের না হয় রেফারীর করণীয় কী? অধিনায়কের সাহায্য চাওয়া। অধিনায়কের অনুরোধ সত্ত্বেও যদি খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে না যায় —তখন খেলা বন্ধ করা ছাড়া রেফারীর অন্য কোন পথ নেই। খেলা বন্ধ করে তিনি কমিটির কাছে ঘটনা রিপোর্ট করবেন। ১৯৬২ সালে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চিলি ও ইতালির খেলার সময় রেফারী কেন অ্যাস্টন কিন্তু ইতালির ফেরিনিকে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্য পুলিশ ডেকেছিলেন, যেটা আইনমাফিক কাজ হয়নি।

তবু আগেই লিখেছি, বহু অভিজ্ঞ এবং যোগ্য রেফারীদেরই বিশ্বকাপের খেলা পরিচালনার জন্য ডাকা হয়। যেমন—এবার আর্জেন্টিনায় ডাকা হয়েছে ৩২ দেশে ৩২ জন নামী রেফারীকে। একজনের পরিচালনা আমরা এই কলকাতার মাঠেই দেখেছি। অবশ্য তিনি ভারতের বা এশিয়ার কোনো দেশের রেফারী নন। ইংল্যাণ্ডের রেফারী। নাম প্যাট পারট্রিজ। '৭৬-এ ইংল্যাণ্ডের ক্রুক টাউন দলের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন।

কথার খেলা

গত সংখ্যায় 'কথার খেলার' প্রথম নির্ভুল উত্তরদাতা ১২, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলকাতা-র শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়। তিনি পাচ্ছেন বিনামূল্যে ৬ মাসের খেলার কথা।

জেলার খবর

২৪ পরগণায় ফুটবল লীগ চলছে

বিপ্লব দাশগুপ্ত : কুড়ি, একুশ এবং ছাব্বিশটি টীম নিয়ে শুরু হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিভিশন লীগ। জেলার নানা মাঠে প্রথম দিনেই হয়েছে ষাটটির বেশী খেলা।

গতবার লীগ মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আদালতের হস্তক্ষেপে। একমাত্র শেষ হয় তৃতীয় ডিভিশন লীগ। চ্যাম্পিয়ন বন্দীপুর সম্মিলনী এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে।

অশোক ব্যানার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী, চিন্ময় চ্যাটার্জি, রঞ্জিত মুখার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুবিমল ঘোষ, শিশির গুহদস্তিদার এবং আরো কিছু নামী ফুটবলার। জেলার লীগে খেলায় উত্তেজনা প্রথম থেকেই ওঠে তুঙ্গে।

মালদায় টেবিল টেনিস

শ্যামল সাহা : মালদহ জেলা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সাব জুনিয়র ও জুনিয়র, বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর বসু চৌধুরী। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যথাক্রমে পি সরকার এবং এস মহাপাত্র।

শিলিগুড়িতে লীগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ শুরু হয়ে গেছে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে।

'শিলিগুড়ি ইউথ কোচিং সেন্টার'-এর পরিচালনায় খো খো, কাবাডি, ফুটবল এবং অন্যান্য খেলার কোচিং চলছে গ্রামে ও শহরে।

জলপাইগুড়িতে বাস্কেট বল

শক্তিব্রত মজুমদার : জলপাইগুড়ি মিলন সংঘের পরিচালনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল আমন্ত্রণী বাস্কেট বল টুর্নামেন্ট।

ফাইনালে কলকাতার বড়বাজার যুবক সভা ৭৭-৭২ পয়েন্টে হারায় কলকাতারই ওয়াই এম সি এ-কে।

বিশ্বকাপ ঃ '৫৮ ও '৬২ ফাইটার

Brazil

ছিমছাম এবং দ্রুতগতির ফুটবল খেলে উনিশশো চুয়ান্নয় দুনিয়া কাঁপিয়েছিল হাঙ্গেরি। আটান্নয় সুইডেনে উড়ল লাতিন আমেরিকান ফুটবলের ঝলমলে পতাকা। পতাকার উপর লেখা ব্রাজিলের নাম।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুলের শেষ ম্যাচে কোচ ভিসেন্ট ফিওলা মাঠে আনলেন দুটি নতুন ছেলেকে—দীর্ঘদিন যারা বিশ্বফুটবলে রাজত্ব করবে। পেলে এবং গারিঞ্চা। পুলের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল ইংল্যাণ্ড খেলায় কোনো গোল হল না। রাশিয়া ব্রাজিলের কাছে হারল ২-০ গোলে।

ব্রাজিল ছাড়া কোয়ার্টার ফাইনালে এল সুইডেন, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স এবং যুগোশ্লাভিয়া।

সেমি ফাইনালে পৌঁছল পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন এবং ব্রাজিল।

প্রথম সেমিফাইনালে ব্রাজিল ফ্রান্সকে কচু-কাটা করল ৫-২ গোলে। নতুন ছেলে পেলের তিন গোল। পরের সেমি ফাইনালে সুইডেন পশ্চিম জার্মানির বাধা টপকাল ৩-১ গোলে।

এবার ফাইনাল। সুইডেনের মাটিতে খেলা। তবু সুইডিশ কোচ বলে রাখলেন ঃ "সুইডেন জিততে পারে, যদি ওদের ফরোয়ার্ডদের পায়ে বল না পড়ে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক এবং এগারোজন সুইডিশ ফুটবলারকে আক্রমণাত্মক ফুটবলের ঝলকানি দেখিয়ে ব্রাজিল জিতল ৫-২ গোলে। ভাভা এবং পেলের দুটি করে গোল।

বাষট্টিতে চিলিতে ব্রাজিল এল সেইরকমই ঝলমলিয়ে।

পুলের খেলায় ব্রাজিল হারাল মেক্সিকো, এবং স্পেনকে (২-০, ২-১)। চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলা ১-১ হল। এবারের অন্য সাত কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট ঃ পশ্চিম জার্মানি, যুগোশ্লাভিয়া, ইংল্যাণ্ড, চিলি, রাশিয়া, এবং হাঙ্গেরি।

সেমি ফাইনালে ব্রাজিল এল ইংল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। চেক টীম হাঙ্গেরিকে কোনরকমে হারাল (১-০)।

প্রথম সেমিফাইনালে ব্রাজিল নাস্তানাবুদ করল চিলিকে (৪-২)। গারিঞ্চা এবং ভাভার দুটি করে গোল।

চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-১ গোলে হারাল যুগো-শ্লাভিয়াকে।

ফাইনালে ব্রাজিলের অবশ্য কিছু ঘাম ঝরল। বিরতির সময় ১-১। শেষ পর্যন্ত কাপ জিতল ব্রাজিল ৩-১ গোলে জিতে।

এবার শুধু অপেক্ষা। আর একবার জুলে-রিমে কাপ পেলেই সেটি চিরকালের জন্য উঠবে ব্রাজিলের ঘরে। অপেক্ষার অবসান হল মাত্র আট বছর পরে।





দুজনেই কাঁদছেন—কিন্তু ভিন্ন কারণে। পেলে কাঁদছেন আনন্দে আটান্নর বিশ্ব কাপ ফাইনালে জেতার পর। ইউসেবিও কাঁদছেন দুঃখে ছেষট্টির সেমি ফাইনালে ইংলণ্ডের কাছে হারার পর।

বিশ্বকাপ : '৬৬ ও '৭০



জয়ন্ত চক্রবর্তী

লণ্ডনের সবকটি পাবলিক বারে সেদিন বয়ে গেল বিয়ারের বন্যা। পানপাত্র হাতে নিয়ে ফুটবল অনুরাগীরা টোস্ট করলেন—"লং লিভ দা মেম্বারস অফ আওয়ার সকার টীম"।

১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইংলণ্ড আর পশ্চিম জার্মানি। ফাইনালের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জন অরণ্যে প্রবল আন্দোলন, জিতবে কে? বাজির দরে ওঠা নামা, বিশেষজ্ঞদের সযত্নে রচিত ভাষ্য নিয়ে ক্লাবে রেঁস্তোরায় তুমুল তর্কাতর্কি। ইংরেজরা স্বভাবত চুপচাপ, কিন্তু সেদিন বিশ্ব কাপের ফাইনালের আগে শামুকের মত খোলস ছেড়ে তাঁরাও বাইরে বেড়িয়ে এসেছিলেন। সাময়িক পত্রের পাতায় এক ইংরেজ ফুটবল অনুরাগী জানালেন : এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের বেশ কটি খেলা আমি দেখেছি। ফাইনালটাও দেখতে পারতাম। আমার টিকিটও ছিল। কিন্তু যাইনি। স্নায়ুর ওই নিরন্তর চাপ সহ্য করতে পারব না বলেই আমার স্ত্রীকে টিকিটটা দিয়ে দিয়েছিলাম। ভাবলাম মাঠে না যাই, টেলিভিশনে খেলাটা দেখব। সেট অন করলাম। পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। ইংলণ্ড মাঠে নামছে। ক্যাপ্টেন ববি মুরের হাতে ওটা কি ফুটবল? নাকি আমার হৃৎপিণ্ড। মনে হল স্কিপার আমার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে লোফালুফি করছেন। অসহ্য উত্তেজনায় টেলিভিশনের সুইচ বন্ধ করে দিলাম। ঠিক করলাম, ঘড়ি মিলিয়ে একদম খেলা শেষের সময়টাতে আবার টি ভি খুলবো। সোফায় বসে এডগার অ্যালেন পোর একটা বই খুললাম। একটা লাইনও পড়তে পারলাম না। পোষা কুকুরটাকে অকারণেই একটা লাথি কষালাম। তারপর এক সময় আবার টি ভি খুললাম। হায় ঈশ্বর! আমি কি জেগে আছি নাকি স্বপ্ন দেখছি? স্টেডিয়ামের বিরাট ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে নিয়ন সাইন জ্বলছে,—ইংলণ্ড ৪ : পশ্চিম জার্মানি ২। টি ভি বন্ধ করে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম সোফায়।"

১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংলণ্ড ৪—২ গোলে হারিয়েছিল পশ্চিম জার্মানিকে। খেলার নিষ্পত্তি হয় অতিরিক্ত সময়ে। ইংলণ্ডের পক্ষে তিনটি গোল করেছিলেন জিওফ হার্স্ট। পশ্চিম জার্মানির হয়ে দুটি গোল শোধ দিয়েছিলেন হেলার এবং ওয়েবার। সেমিফাইনালে ইংলণ্ড ২—১ গোলে হারিয়েছিল পর্তুগালকে। অন্য সেমিফাইনালে ঐ একই ব্যবধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন হার মেনেছিল পশ্চিম জার্মানির কাছে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে ইংলণ্ড একগোলে আর্জেন্টিনাকে এবং পশ্চিম জার্মানি ৪—১ গোলে উরুগুয়েকে পরাস্ত করেছিল।

বিভাগীয় লীগে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক গ্রুপে ছিল উরুগুয়ে, ফ্রান্স এবং মেক্সিকো। গ্রুপের প্রথম খেলায় উরুগুয়ের সঙ্গে ০—০ গোলে ম্যাচ শেষ করলেও ইংলণ্ড দুগোলে হারায় মেক্সিকো এবং ফ্রান্সকে।

অন্যদিকে পশ্চিম জার্মানির গ্রুপে ছিল সুইজারল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা এবং স্পেন। পশ্চিম জার্মানি গ্রুপ লীগের প্রথম খেলায় সুইজারল্যাণ্ডকে হারায় পাঁচ গোলে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের খেলা ০-০ হয়। স্পেন পশ্চিম জার্মানির কাছে হারে ১-২ গোলে। এক নম্বর বিভাগ থেকে ইংলণ্ড এবং উরুগুয়ে, দু নম্বর থেকে পশ্চিম জার্মানি এবং আর্জেন্টিনা, তিন নম্বর থেকে পর্তুগাল এবং হাঙ্গেরি এবং চার নম্বর বিভাগ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এশিয়ার প্রতিনিধি উত্তর কোরিয়া নক আউট পর্যায়ে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য উত্তর কোরিয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পর্তুগালের কাছে হারে ৩—৫ গোলে। ০—৩ পিছিয়ে থাকা পর্তুগাল সেদিন জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল একা ইউসেবিওর দাপটে। ইউসেবিও করেছিলেন চার গোল। শেষ কোয়ার্টার ফাইনালটিতে রাশিয়া ২—১ গোলে হারায় হাঙ্গেরিকে।



মজাদার জার্মান গোলকীপার মায়ার।

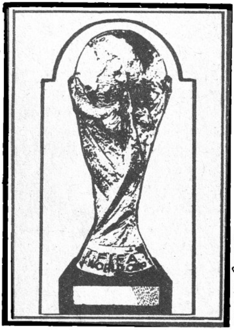
১৯৬৬-র বিশ্বকাপের আর একটি বড় ঘটনা, ফুটবল সম্রাট পেলের দল ব্রাজিলের গ্রুপ লীগ থেকে বিদায় নেওয়া। তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলের সঙ্গে ছিল বুলগেরিয়া, পর্তুগাল এবং হাঙ্গেরি। ব্রাজিল বুলগেরিয়াকে ২—০ গোলে হারালেও পর্তুগাল এবং হাঙ্গেরির কাছে হেরেছিল। পেলের বিরুদ্ধে পাতা হয়েছিল একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের জাল। শোনা যায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক ববি মুর নাকি বিশ্বকাপের আগে বলেছিলেন— "পেলেকে ব্রাজিল দল থেকে সরিয়ে দাও, আমি ইংলণ্ডকে বিশ্বকাপ এনে দেব।"

ঘটনাটি কতদূর সত্য সে কথা জানা নেই, তবে অন্যায় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত পেলে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সে অন্য কাহিনী, অন্য গল্প।

ব্রাজিল কি পারবে? উনিশশো সত্তরের বিশ্বকাপের আগে সমস্ত ফুটবল দুনিয়ার এই একটিই জিজ্ঞাসা। চারবছর আগে ইংলণ্ডের আসরে যে ব্রাজিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন, দেশে ফেরার পর জনতার ক্ষোভ থেকে যে দলকে বাঁচাতে বিমান বন্দরে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, তারা কি পারবে ফুটবলের সোনার পরীটিকে চিরতরে নিয়ে যেতে?

ইংলণ্ড থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফেরার পর একজন কালো মানুষ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ব্রাজিলকে আবার বিশ্ব ফুটবলের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে হবে। সেই কালো মানুষটির নাম অ্যাডসন অ্যারান্টোস দা ন্যাসিমন্টো। পেলে দিনের পর দিন সতীর্থদের উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন দলের সব কজন খেলোয়াড়কে নিয়ে কঠোর অনুশীলনে মেতেছেন। অবশেষে চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন এল। চল মেক্সিকো সিটি…

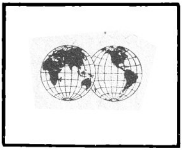
বিভাগীয় লীগ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে



উঠতে ব্রাজিলকে লড়তে হল। তিন নম্বর গ্রুপে তারা চেকোস্লোভাকিয়াকে হারাল ৪—১ গোলে। আগেকার বিজয়ী ইংলণ্ডকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নতি স্বীকার করতে হল ব্রাজিলের কাছে। রুমানিয়ার চ্যালেঞ্জ ডিঙালো ব্রাজিল ৩—২ গোলে। এই বিভাগ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল ব্রাজিল ও ইংলণ্ড। অন্যান্য বিভাগগুলি থেকে সোবিয়েত ইউনিয়ন ও মেক্সিকো, ইতালি ও উরুগুয়ে এবং পশ্চিম জার্মানি ও পেরু কোয়ার্টার ফাইনালে এল।

ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুকে হারাল অনায়াসে ৪—২ গোলে। পশ্চিম জার্মানি ইংলণ্ডকে পরাস্ত করল ৩—২ গোলে। উরু-গুয়ের কাছে হার মানল সোবিয়েত ইউনিয়ন নামমাত্র গোলে এবং ইতালি সহজেই জিতল ৪—১ গোলে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। এবার সেমিফাইনাল। ব্রাজিল বনাম উরুগুয়ে। ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানি। ব্রাজিল সেমিফাইনালে জিতল ৩—১ গোলে। অন্যদিকে ইতালি ফাইনালে উঠল এক অবিস্মরণীয় ম্যাচে পশ্চিম জার্মানিকে ৪—৩ গোলে হারিয়ে। নাটকের ক্লাইম্যাক্সে এবার ব্রাজিল-ইতালি মুখোমুখি। ফেভারিট ব্রাজিলই। পেশাদার জুয়াড়ীদের বাজীর দরও তাদের দিকে। সমগ্র বিশ্বে থর থর উত্তেজনা... ... ব্রাজিল কি পারবে ?

জুলে রিমে ট্রফিটিকে চিরকালের জন্য ব্রাজিলে রেখে দেওয়ার অধিকার অর্জন করতে পেলের দল ইতালিকে হারাল ৪—১ গোলে। ব্রাজিলের গোলদাতা পেলে, গারসন, জাইরজিনহো এবং দলপতি কার্লোস অ্যালবার্টো। ইতালির পক্ষে একটি গোল শোধ করলেন বনিনসেনা।



ব্রাজিল দল দেশে ফেরার পর বিমান বন্দরে পেল বিশাল অভ্যর্থনা। মানুষের মাথায় মাথায় টারম্যাক থেকে তাঁরা পৌঁছে গেলেন গাড়িতে। উনিশশো ছেষট্টির তিক্ত স্মৃতি ভুলিয়ে দিল ১৯৭০। জুলে রিমে কাপ ব্রাজিলের। চির-কালের জন্য।



১৯৭০-এর বিশ্বকাপে ইতালি-জার্মানির খেলা দেখছেন জার্মান কোচ হেলমুট শোন



বলুনতো কে ?

এবার যে ফুটবলারকে হাজির করা হচ্ছে, তাকেও আপনারা খুব চেনেন। গতবারে অনেকেই ঠিক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, নির্ভুল জবাব যিনি সবার আগে পাঠাবেন, তাঁকেই দেওয়া হবে পঁচিশ টাকা।

ঠিক বলেছেন

গত সংখ্যার 'বলুনতো কে'র উত্তর এসেছে চারশোর কাছাকাছি। প্রথম উত্তরদাতা সুইনহো রোডের বাপী দত্ত। কিন্তু প্রায় সকলেই ঠিক নাম বলেছেন : গৌতম সরকার।

বেশ কিছু পাঠক ভুল করে বলেছেন বিদেশ বসু। শিবাজী, সুধীর, কম্পটন প্রসূন, হাবিব, সুরত, মানস এবং শঙ্কর ব্যানার্জির নামও এসেছে। একজন আবার বলেছেন ভাস্কর গাঙ্গুলি।

ভারতীয় ফুটবল একাদশ ঃ ১৯৭৮

সুকুমার সমাজপতি



। সুব্রত ভট্টাচার্য

এবার ব্যাঙ্ককে এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ভারতীয় ফুটবলের শক্তি যতই সীমিত হোক, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব এদেশের ফুটবলের কর্ণধারদের চেষ্টা করতে হবে এক শক্তিশালী দল গঠনের। অন্তত সেই প্রচেষ্টায় যাতে কোনো ফাঁক না থাকে সে ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া দরকার। শুনেছি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এ আই এফ এফ রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলোকে অনেক আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন যে আগস্টের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিতে হবে এশিয়ান গেমস উপলক্ষে আয়োজিত সর্বভারতীয় ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে যোগদানের জন্যে। জানিনা বাস্তবে কতখানি এর রূপায়ন সম্ভব। কেননা প্রায়ই দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্ব অর্জনের চেয়ে আমরা অনেক বেশী উৎসাহ বোধ করি প্রাদেশিক পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনে — হয়তো বা আরো বেশী গৌরব বোধ করি নিজ নিজ ক্লাবের সাফল্যে। আর খোঁজ করলে দেখা যাবে যে সে দোষে দুষ্ট বোধ হয় সব থেকে বেশী এই রাজ্যের লোকেরাই ; এর কারণও অবশ্য খুবই স্পষ্ট। যে জিনিসের চর্চা যেখানে যত বেশী, তাকে ঘিরে হৈ চৈ সেখানেই তত বেশী। যাই হোক, মোটামুটি সম্ভাব্য দল কি হতে পারে — তার ওপরেই আপাতত আমরা আলোকপাতের চেষ্টা করব।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সে কাজ হয়ত খানিকটা সহজ হয়েছে। কারণ বিভিন্ন রাজ্যের সেরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। অবশ্য একথা ঠিকই যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চোটের দরুণ বা অন্যান্য কোনো কারণে কয়েকজন খেলোয়াড়কে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। তাই জাতীয় ফুটবল দল গঠনের সময় তাঁদের কথা সরাসরি ভুলে গেলে তাঁদের ওপরে মারাত্মক অন্যায় করা হবে —বিশেষতঃ যখন তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে নাম করেছেন। তাই এখানে যে কয়জনের দল আমরা গঠন করব সেটাই চূড়ান্ত ধরে না নিয়ে আরও অন্তত কয়েকজনকে ট্রায়ালে ডেকে তারই মধ্যে থেকে শক্তিশালী দল গড়ে নিতে হবে।

গোলকিপার হিসেবে যাঁকে প্রথমেই মনে পড়ছে তিনি আমাদের বাংলারই ভাস্কর গাঙ্গুলী। গত দু'বছরে তাঁর খেলায় যে ক্রমোন্নতি আমরা দেখেছি তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর সপ্রতিভ আচরণ। জাতীয় ফুটবলেরও প্রতিটি খেলায় তাঁর এই সপ্রতিভতাই আর সব গোলকিপারের থেকে তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে। এমন কি পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফাইনালের প্রথম দিনের খেলায় শূন্যে বল আয়ত্তে করতে গিয়ে ফসকাবার পরেও কিন্তু তাঁর এই সপ্রতিভতায় এতটুকু চিড় খায়নি। এই সপ্রতিভতারই বোধহয় আর এক নাম আত্মবিশ্বাস। আর খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস তখনই দেখা যায় প্রবল যখন খেলার প্রতিটি কৌশলই তার আয়ত্তে এসে যায়। ভাস্করের পরেই যার নাম মনে আসে তিনি পাঞ্জাবের সুরজিৎ সিং। বাংলার মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখেও তিনি যেমন ঠাণ্ডা মাথায় বলের পর বল বাঁচিয়ে গেছেন তা দেখে বাংলার ক্রীড়ানুরাগী দর্শকেরা তারিফ না করে পারেননি। এবারের জাতীয় ফুটবলাররা কিন্তু গোলে আর নতুন কোনো প্রতিভার সন্ধান দিতে পারেনি।

ব্যাকে যাঁদের নাম সব থেকে আগেই মনে আসে তাঁরা হলেন কেরালার রাইট ব্যাক ফিলিপ, বাংলার রাইট স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্য, পাঞ্জাবের স্টপার গুরুদেব সিং ও বাংলার লেফট ব্যাক দিলীপ পালিত। আর একজনকে বাদ দিলে অবশ্য খুব অন্যায় করা হবে। তিনি বাংলার রাইট ব্যাক চিণ্ময় চ্যাটার্জি। বিশেষ করে তিনি পুনরনুষ্ঠিত ফাইনালে প্রদীপ চৌধুরী বেরিয়ে যাবার পরে স্টপারের অনভ্যস্ত জায়গায় যে বীরবিক্রমে লড়েছেন তার ছবি বাংলার দর্শকদের চোখের সামনে বহুদিন ভাসবে। তবু রাইট ব্যাক হিসেবে ফিলিপ্-এর নৈপুণ্যকে তিনি ছাপিয়ে যেতে পারেননি। এ বছরের জাতীয় ফুটবলে যে ক'জন ডিপ্ ডিফেণ্ডারকে আমরা দেখেছি তাঁদের মধ্যে ফিলিপের মতো বলের ওপরে দখল আর কারুর মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি।

তবে তিনি মূলতঃ আক্রমণাত্মক ব্যাক আন্তর্জাতিক খেলায় রক্ষণাত্মক ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁকে আরও একটু সচেতন থাকতে হবে। সুব্রত ভট্টাচার্য গত মরশুমে শেষের দিক থেকে যে প্রভূত উন্নতি করেছেন সেটা কিন্তু কলকাতার প্রতিটি দর্শকই লক্ষ্য করতে ভোলেননি। আর জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের সম্ভবত তিনিই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি প্রতিটি খেলা একই রকম ভাল খেলে গেছেন। গত বছরের শীল্ড ফাইনাল থেকেই বোঝা গেছে 'কভারিং'— অর্থাৎ নিজেদের গোল সীমানার মধ্যে বিপক্ষ দল যে অরক্ষিত জায়গার সুযোগ নিয়ে বিপদের সচনা করতে পারে — সেই অরক্ষিত বিপদজনক জায়গা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলগানোর কাজে তিনি কত তৎপর হয়েছেন। একই কথা খাটে দিলীপ পালিত সম্বন্ধে। দ্বিতীয় পর্বের ফাইনালে তিনি আত্মঘাতী গোল দিয়েছিলেন একথা যেমন সত্যি, আবার একথাও ঠিক যে ইন্দর সিংকে আটকে দেবার জন্য যে জায়গায় থেকে দৌড় শুরু করে তিনি প্রায় কভার করে ফেলেছিলেম তা সহজ কাজ ছিল না। শুধু দুঃখ এই যে তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

লেফট স্টপার গুরুদেব সিং যে যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং এখনও পুরোপুরি সামর্থে ভরপুর তার স্বাক্ষর তিনি বারবারই রেখেছেন। শুধু তাই নয়, এও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে দল যখন চাপের মুখে তখন এলোপাথাড়ি খেলতে তিনি যেমন পটু তেমনই সমান দক্ষ গঠনমূলক খেলায়। আবার যদিও তিনি জাতীয় ফুটবলে রাইট স্টপার খেলেছেন, এখানে তাঁকে লেফট স্টপার হিসেবে দেখেছি দলেরই স্বার্থে। ডিপ্ ডিফেণ্ডারদের মধ্যে আর যাঁদের কোচিং ক্যাম্পে' ডাকা উচিত তাঁরা হলেন বাংলার শ্যামল ঘোষ ও শ্যামল ব্যানার্জি, পাঞ্জাবের লেফট স্টপার পাত্মার, রেলওয়ে দলের অশোক চক্রবর্তী ও বিপ্লব মজুমদার এবং বিহার দলের লালন দুবে ও সুভাষ মুখার্জী।

হাফ হিসেবে ভারতীয় দলে কাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সে কথা সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণটা অবশ্য আমার হয় যতখানি না খেলার উৎকর্ষ তার চেকও অনেক বেশী সারা ভারতবর্ষে হাফ খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতা। তাই গৌতম সরকার প্রসুন ব্যানার্জি ছাড়া তৃতীয় আর কারুর নাম আমাদের চট করে মনে আসে । আর এই উক্তিকে হয়ত অনেকেই গৌতম ও প্রসুনের সামর্থ্যের প্রতি পরোক্ষভাবে কটাক্ষপাত বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু আমার এই উক্তির পেছনে কারণ একটাই, আরও কয়েকজন দক্ষ হাফ থাকলে হয়ত গৌতম ও প্রসুনের থেকে আমরা আরো বেশী কিছু আশা করতে পারতাম। আর সেক্ষেত্রে লাভবান হত ভারতীয় ফুটবলই। তবে এঁদের দু'জনের পরেই যিনি ভারতীয় দলে স্থান পাবার দাবী জোরদার করেছেন তিনি কেরালার লেফট হাফ জেকব। আক্রমণে যেমন খড়্গহস্ত রক্ষণকার্যেও তিনি তেমনই পারদর্শী। সেই সঙ্গে বিপক্ষের গোলে চকিতে শটও নেন। তাই গৌতম বা প্রসুনের সঙ্গে তিনি সমান তালে পাল্লা দিলেও খুব বেশী আশ্চর্য হব না। দলে আর একজন হাফ যাকে নেয়া যেতে পারে তিনি কেরালা দলের রাইট হাফ ও অধিনায়ক হামিদ।

ফরোয়ার্ড লাইনে যে প্রথম চারজনের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয় তাঁরা হলেন রাইট আউট সুরজিত সেনগুপ্ত, রাইট স্ট্রাইকার কেরালার জেভিয়ার পায়াস্, লেফট স্ট্রাইকার পাঞ্জাবের হরজিন্দর সিং ও লেফট আউট বিদেশ বসু। খেলোয়াড় হিসেবে সুরজিতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে মাঝে মাঝেই যেমন 'অফমুড' হতে দেখা যায় — আন্তর্জাতিক খেলায় ওর শিকার হলে তাঁকে কিন্তু মূল্য দিতে হবে অনেক বেশী। জেভিয়ার পায়াসের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম সেমিফাইনাল খেলা যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই বলেছেন সূক্ষ্ম পায়ের কাজে ও বুদ্ধিদীপ্ত হঠাৎ হঠাৎ জায়গা পরিবর্তনে তাঁর কি অপরিসীম দক্ষতা। দলের তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রে বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক পটুতার যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধন তিনি করেছিলেন হয়তো আন্তর্জাতিক ফুটবলের ক্ষেত্রেও তার তুলনা মেলা ভার। আর হরজিন্দরের আলোচনা উঠলেই আমি শিশুর মত উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারিনা। তিনি ফুটবলের এক দুর্লভ শিল্পী। যে ক'দিনই ওর খেলা দেখেছি সে ক'দিনই মনে হয়েছে যেন নতুন কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরলাম। বিদেশ বসু সম্বন্ধে বলতে পারি তাঁর খেলায় হয়ত এখনও অনেক পরিমার্জনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আজকের ভারতীয় ফুটবলে তাঁর মত 'পেনিট্রেটিভ' অর্থাৎ প্রতিপক্ষ রক্ষণব্যূহকে তছনছ করে দেবার ক্ষমতা সম্পন্ন খেলোয়াড় বেশী নেই, এর যথার্থতা তিনি প্রমান করে দিয়েছেন সন্দেহাতীত ভাবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্বের ফাইনালের দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়।

ফরোয়ার্ড লাইনে আর যাঁদের অন্তর্ভুক্তি সঙ্গত কারণেই হতে পারে তাঁরা হলেন কেরালার রাইট স্ট্রাইকার নাজীব ও বাংলার উলাগানাথন। আরও যাঁদের কোচিং ক্যাম্পে ডাক পাওয়া উচিত তাঁরা হলেন রেলওয়ের স্ট্রাইকার বীরবাবু ও রাইট আউট অশোক চন্দ, তামিলনাড়ুর লেফট স্ট্রাইকার লতিফ ও পাঞ্জাবের লেফট আউট পরমিন্দর সিং।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে এগারোজনকে প্রথম ভারতীয় দলে আনা যেতে পারে তাঁদের নাম নীচে দিয়ে দিলাম। আর সেই সঙ্গে পাঠকদের প্রতি রইল বিনীত অনুরোধ — তাঁরা যেন ভুলেও ভেবে না বসেন যে আমি নিজেকে একজন সবজান্তারূপে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। সামান্য খেলেছি আর তারই সুবাদে এই দুঃসাহস।

গোল ঃ ভাস্কর গাঙ্গুলী। ব্যাক ঃ প্রেমনাথ ফিলিপ, সুব্রত ভট্টাচার্য, গুরুদেব সিং এবং দিলীপ পালিত। লিন্‌কম্যান ঃ গৌতম সরকার ও প্রসুন ব্যানার্জি। ফরোয়ার্ড ঃ সুরজিৎ সেনগুপ্ত, জেভিয়ার পায়াস, হরজিন্দর সিং এবং বিদেশ বসু।

ভারতীয় ফুটবল একাদশঃ ১৯৭৮

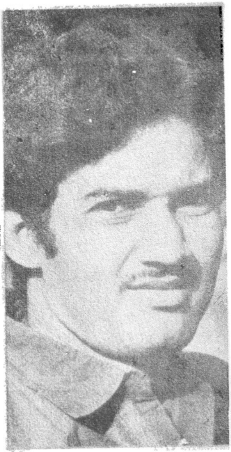
পরিমল দে

সেরা ভারতীয় দল গড়ার কাজটা আমাকে না দিলেই ভাল হত। কারণ এবার সন্তোষ ট্রফিরও সব খেলা আমি দেখিনি। যদি জানতাম এমন একটা ঝামেলায় পড়তে হবে তাহলে মন দিয়ে সব খেলা দেখে রাখতাম।

আমি আমার পছন্দমতো একটা টীম করছি। এর বাইরে যোগ্যতর খেলোয়াড় থেকে যেতে পারে।

গোলে আমি চাইব ভাস্কর গাঙ্গুলীকে। ভাস্করের খুব কাছাকাছি আছে গোয়ার ব্রহ্মানন্দ।

দুই সাইড ব্যাক হিসেবে আমি দলে আনতে চাই বাংলার চিন্ময় চ্যাটার্জি এবং শ্যামল ব্যানার্জিকে। এরা দুজনই তরুণ অথচ পরিণত। এদের পরে নাম আসে দিলীপ পালিতের। দুই স্টপার থাকবে গুরুদেব সিং এবং সুব্রত ভট্টাচার্য। অতিরিক্ত শ্যামল ঘোষ।



গৌতম সরকার

দুই লিনক্ম্যান আমার নির্বাচনের অপেক্ষা রাখেনা। গৌতম আর প্রসুনের আসল গুন জায়গামতো এবং সময়মতো ভালো খেলা। অতিরিক্ত হতে পারে কেরলের জেকব অথবা কর্ণাটকের দেবরাজ।

দুই উইঙ্গারওতো সেই বাংলার। সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং বিদেশ বসু। এদের বাদ দেওয়া কি কারো পক্ষেই সম্ভব?

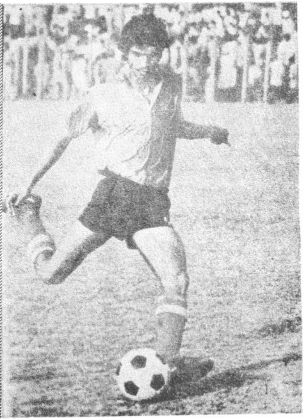
অবশ্য, স্ট্রাইকার হিসেবে কোনো বাংলার খেলোয়াড়কে নেওয়া আমার পক্ষেও অসম্ভব। প্রথম টীমে আসা উচিৎ ইন্দর এবং হরজিন্দরের। ইন্দরের বয়স যেহেতু ছত্রিশ, সেহেতু তাকে আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলানো যাবেনা এটা ঠিক না-ও হতে পারে। ইন্দর এখনও সেরা। অতিরিক্ত রাখতে চাই কেরলের নাজীব এবং পায়াসকে।

আমার টীম: ভাস্কর গাঙ্গুলী, চিন্ময় চ্যাটার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, গুরুদেব সিং ও শ্যামল ব্যানার্জি, গৌতম সরকার ও প্রসুন ব্যানার্জি, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ইন্দর সিং হরজিন্দর সিং এবং বিদেশ বসু।

অতিরিক্ত: ব্রহ্মানন্দ, দিলীপ পালিত, শ্যামল ঘোষ, জেকব, দেবরাজ, নাজীব এবং জেভিয়ার পায়াস।



শ্যামল ব্যানার্জি



সুরজিৎ সেনগুপ্ত

শ্যাম

অশোক দাশগুপ্ত



চিন্টু ক্যারাটে শিখছে বাবার কাছে



শ্যাম ছেলেকে শেখাচ্ছে ক্যারাটে—কিন্তু গেঞ্জিতে ঠিকই লেখা আছে 'ফুটবল'।

শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম। মশাই আপনি শ্যামকে নিয়ে এত নাচেন কেন? এই প্রশ্ন গত তিন বছরে কতো লোকের মুখেই যে শুনলাম। প্রতিবারই উত্তরে আমি হেসেছি, তবে তৎক্ষণাৎ নয়। যেমন ধরুন, গত বছর ৯ জুলাই লীগ ম্যাচে মোহনবাগান হারার পর এক বন্ধু সাংবাদিক বলেছিলেন: "এইতো শ্যাম থাপা, তাকে নিয়ে এত নাচানাচি। তুমি নাচো কেন?" এর উত্তরে আমি হেসেছিলাম আশী দিন পরে, আটাশে সেপ্টেম্বর বিকেলে, যখন শ্যামের শরীরের একটি মোচড়ে চুরচুর করে ভেঙে পড়ে ইস্টবেঙ্গলের সাজানো দুর্গ, শীল্ড জেতে মোহনবাগান।

কিন্তু গল্প শুনুন।

এ বছর ফেডারেশন কাপে মোহনবাগান-জে সি টি খেলায় বাঁধল তুমুল গণ্ডগোল। গৌতম ফাউল করল ইন্দরকে। পারমার ছুটে এসে মারল গৌতমকে। গুরুবচন ফ্ল্যাগপোস্ট তুলে মুখ ফাটাল প্রদীপ চৌধুরীর। মাঠের বাইরে বসা পিন্টু চৌধুরী পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্ত ঝরা থামাল। পারমার তখনও



ছোট পরিব

গৌতমের ওপর চড়াও। একজন মোহনবাগান ফুটবলার ছুটে গেল গৌতমকে বাঁচাতে। এবার ওকে ঘিরে ধরল পাঞ্জাবের সাতজন ফুটবলার। আমাদের ফুটবলার ব্র্সলী একা লড়ল। একটু আঘাত পেল। কিন্তু একাই রুখে দিল সাত-সাতজন স্বাস্থ্যবান মানুষকে। এই ফুটবলারটি শ্যাম থাপা।

উনিশশো ছিয়াত্তরের উনত্রিশে জুলাই। ক্যামাক স্ট্রীট আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ে এক পাগলা মিনি বাস আমায় আদর করে ধাক্কা মারে। বাঁ কনুই ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে, তখন অফিস-ফেরতা এক ব্যাঙ্ক চাকুরে পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। তারপর ট্যাক্সিতে করে ফোর্ট উইলিয়ামে নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে ওষুধ লাগায়। এই ছেলেটির নামও শ্যাম থাপা।

উনিশশো সাতাত্তরের ৮ জুলাই রাত্রে ফোর্ট উইলিয়ামের আশেপাশে ময়দানে একটি স্কুটার উদ্দেশ্যবিহীন পাক খাচ্ছিল। সেই স্কুটারের উদ্‌ভ্রান্ত চালক সন্ধ্যেবেলায় আমাকে বলেছিল ঃ "ইয়ার, কাল ফাস্ট টীমে আমি নেই। গুড নাইট। আমি এখন একটু ঘুরব।" বুঝতেই পারছেন, এর নামও শ্যাম থাপা।

ভারতের রাশিয়া সফরে ক্যাপ্টেন ছিলেন অরুণ ঘোষ। এক অনুষ্ঠানে অনুরোধ এল ঃ ইণ্ডিয়ান গান শুনতে চাই। একজন ফুটবলার





শ্যাম থাপা—

ভাবল, এমন গান গাইলে হয়, যাতে আন্তর্জাতিক ব্যাপার-ট্যাপার একটু থাকবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে ওর মনে এল, রাশিয়ায় দারুণ পপুলার ফিল্মস্টার হলেন রাজ কাপুর। সুতরাং রাজকাপুরের ছবি থেকে গান ধরল ঃ "মেরে জুতা হ্যায় জাপানি।" রুশ পাবলিক খুব খুশি। আর খুশি আমার প্রিয় ফুটবলার, শ্যাম।

উনিশশো ছেষট্টিতে একজন ফুটবলার মাত্র আঠারো বছর বয়সে কলকাতা ময়দানে আসে দূর দেরাদুন থেকে। প্রথম খেলায় রাজস্থানের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক। ছেষট্টিতে ইস্টবেঙ্গল লীগ পেল। এই ছেলেটিই কলকাতা ছেড়ে গিয়ে আবার উনিশশো সত্তরে ফিরে এলো ইস্টবেঙ্গলে। ইস্টবেঙ্গল সেবারও লীগ চ্যাম্পিয়ন। ছেলেটি ফের কলকাতা ছেড়ে চলে যায় বোম্বাই। ফিরে আসে পঁচাত্তরে, সেবারও ইস্টবেঙ্গল লীগ চ্যাম্পিয়ন। লাকি শ্যাম!

তিরিশ বছর বয়সী শ্যাম থাপা কবে কোথায় জন্মেছে, কবে কতো গোল করেছে — সবই আপনাদের জানা। এই জানার বাইরেও একজন শ্যাম থাপা আছে, যে সরল, উদার, বুদ্ধিমান এবং ভাগ্যবান। মাঠে না হোক, ছবিতেতো ওকে হাসতে দেখেছেন। সূর্য থেকেই খানিক আলো পায় চাঁদ। বন্ধু শ্যামের থেকেও সামান্য হাসি ধার করেছি আমি। সেই হাসি আমি ব্যবহার করি মাঝেমধ্যে, যখন আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সেই পরিচিত প্রশ্ন ঃ "মশাই আপনি এত শ্যাম শ্যাম করে নাচেন কেন?"



শ্যাম থাপা—বারো বছর আগে।

ভারতীয় ফুটবল একাদশ ঃ ১৯৭৮

প্রদ্যোৎ বর্মণ

যদি প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয় ফুটবল একাদশ গড়ার আমি কে ?—তাহলে সবিনয়ে নিবেদন করব ঃ আমি একজন সামান্য ফুটবলার, যে দল এবং দেশের হয়ে সাধ্যমত ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে। আমি ফুটবলের পণ্ডিত নই। এবার সন্তোষ ট্রফির খেলা দেখে যাদের যোগ্য মনে হয়েছে, কোনোরকম দ্বিধা না করে তাদের নিয়েই সম্ভাব্য ভারতীয় দল গড়ার চেষ্টা করছি।

ভাস্করের খেলা আমার ভালোই লাগে। কিন্তু ভারতীয় দলের গোলকীপার হিসেবে আমার পছন্দ পাঞ্জাবের সুরজিৎ সিং। বিদেশী কোচেরা এখন ছয় ফুটের নীচে কোনো গোলকীপার নিতে চাননা। শতকরা নব্বই ভাগ বল আসে কোমরের উপরে। ভাস্করের হাইটই ওর বড় গোলকীপার হবার পথে বড় বাধা। গোলমুখে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল ডান এবং বাঁ দিক থেকে আসা উঁচু সেন্টার। গোলকীপার লম্বা না হলে সেই বল বেরিয়ে এসে ধরা সম্ভব নয়। অথচ না ধরলে বিপদ বাড়ে। দ্বিতীয় গোলকীপার হিসেবে আমি বেছে নেব গোয়ার ব্রহ্মানন্দকে।

দুই স্টপার হবে সুব্রত ভট্টাচার্য এবং প্রদীপ চৌধুরী। সুব্রত ভট্টাচার্য এখন নিঃসন্দেহে ভারতের সেরা স্টপার। প্রদীপ চৌধুরী না গুরুদেব সিং—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। তবে একই টীমে খেলার সুবাদে সুব্রতর সঙ্গে প্রদীপের ভালো বোঝাপড়া থাকায় আমি প্রদীপকে দলে রাখছি। অতিরিক্ত গুরুদেব সিং।

রাইট ব্যাক অবশ্যই চিন্ময় চ্যাটার্জি। কেরালার প্রেমনাথ ফিলিপ অতিরিক্ত থাকতে পারে। ফিলিপের খেলা দর্শনীয়, কিন্তু কাজের খেলা খেলে চিন্ময়। সন্তোষ ট্রফির খেলার ভিত্তিতে লেফট ব্যাকে আসে দিলীপ পালিত। কিন্তু শ্যামল ব্যানার্জি খেলতে পারলে কি হত জানিনা। এ বছর শ্যামল বাইরে যা খেলেছে, তাতে মনে হয় ওকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দল গড়া অসম্ভব।

দুই উইং হাফ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই গৌতম সরকার এবং প্রসূন ব্যানার্জি। ওরা দরকারের সময় ঠিকই খেলে দেয়। অতিরিক্ত রাখা যায় কেরালার জেকবকে।

দুই উইঙ্গার নিয়েও কোনো দ্বিধা নেই। সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং বিদেশ বসু। অতিরিক্ত থাকবে উলাগানাথন।

স্ট্রাইকার বাছতে গিয়েই সম্ভবতঃ আমি বিতর্কের সৃষ্টি করব। জানি, অনেকে খুশী হবেননা। তবু, আমার যা মনে হয় তা বলতেই হবে। দেখুন, আমি হরজিন্দর সিংকে বাদ দিতে চাই। হরজিন্দর নিশ্চয় আর্টিস্ট। কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবলের কঠিন লড়াইতে অমন নরম ধাতের ফুটবলার কিছু করতে পারবেনা। আমার পছন্দ ইন্দর সিং এবং নাজীব। ছত্রিশ বছর বয়সে বড় ফুটবল খেলা নিশ্চয় কঠিন। কিন্তু ইন্দর এখনও ভারতের সেরা স্ট্রাইকার। নাজীবের খেলা আগে দেখিনি। এবার দেখে মন ভরে গেছে। ইন্দর যদি একান্তই না খেলে, তাহলে দলে আসবে কেরালার জেভিয়ার পায়াস।



বিদেশ বসু



প্রদীপ চৌধুরী

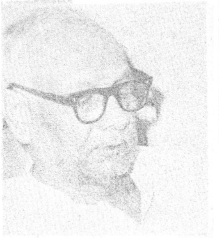
আমার টীম ঃ সুরজিৎ সিং, চিন্ময় চ্যাটার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী এবং শ্যামল ব্যানার্জি ; গৌতম সরকার এবং প্রসূন ব্যানার্জি; সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ইন্দর সিং, নাজীব এবং বিদেশ বসু।

অতিরিক্ত ঃ ব্রহ্মানন্দ, প্রেমনাথ ফিলিপ, গুরুদেব সিং, দিলীপ পালিত, জেকব, উলাগানাথন এবং জেভিয়ার পায়াস।



সেই পাঁচজন ফরোয়ার্ড

জ্যোতিষ গুহ



ইষ্টবেঙ্গলের সেই দুর্ধর্ষ পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম, ভেঙ্কটেশ চলে গেলেন। ঐ পাঁচজন ফরোয়ার্ডকে নিয়ে এই অসাধারণ রচনাটি লিখেছেন জে সি গুহ, যিনি এদের পাঁচজনকে একসঙ্গে খেলিয়েছিলেন।

পর পর ছ'বার লীগ জিতে ইষ্টবেঙ্গল যে রেকর্ড করেছে তাকে কেউই ছোট করে দেখবেনা। কিন্তু ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ এবং সালে--এই পাঁচজন ফরোয়ার্ডের কথায় আজও সকলে যেরকম উচ্ছ্বসিত হয়, তার তুলনা হয়না।

ডান দিক থেকেই শুরু করা যাক। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকের আগে শিলং ক্যাম্পে ভেঙ্কটেশকে দেখে শ্রীবলাই দাস চ্যাটার্জি বলেছিলেন ওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ও তখন রাইট ইনে খেলত। আমি ওকে আপ্পারাও-এর পাশে রাইট আউটে নিয়ে এলাম। ও খেলতে চায়নি। আমি বলেছিলাম, "তুই আউটেই ভালো খেলবি।" ভেঙ্কটেশ মাথা নীচু করে খেলত। ওভাবে ইন-সাইডে খেলা যায় না। দু'পায়ে প্রচণ্ড শট এবং বডি সোয়ার্ভ করার ক্ষমতা দেখেই আমি ওর ওপর আস্থা রেখেছিলাম। কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করে, "ভেঙ্কটেশ এবং প্রদীপ ব্যানার্জির"--আমি প্রশ্নকর্তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, "ভেঙ্কটেশ এবং প্রদীপ ব্যানার্জির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে—এইতো নিঃসন্দেহে ভেঙ্কটেশ।" প্রদীপও বড় ফুটবলার, তবে ভেঙ্কটেশ আরো বড়।

রাইট ইনে আপ্পারাও। আমেদ সবাইকে বকাবকি করত। কিন্তু আপ্পারাও কোনো ভুল করলে মুখ ফিরিয়ে ফিক ফিক করে হাসত। ভাবখানা এই, আপ্পারাও-এরও ভুল হয়'

শেষের দিকে আমেদকে যখন আবার নিয়ে এলাম, ওর ভাই সারমাদ খানও তখন ইষ্টবেঙ্গলে। একদিন দেখি, টেন্টে আপ্পারাও-এর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমেদ সারমাদকে বলছে, "প্রণাম কর। আমারও গুরু।"

একবার শীল্ড ফাইনালের আগের রাত্রে আপ্পারাও হাঁপানির জন্য এক মিনিটও ঘুমোতে পারেনি। ডাক্তার ঘুমোবার ওষুধ দিয়ে বললেন, খেলার আগে এবং মাঝে অক্সিজেন দিতে হবে খেলার আগে যন্ত্রপাতি দেখেতো সবাই অবাক। ব্যাপারটা কি? আমি বলেছিলাম, "একটা নতুন কিছু করতে হবেতো, তাই।" খেলার আগে আর হাফটাইমে আপ্পাকে অক্সিজেন দেওয়া হল। যে খেলা সেদিন আপ্পারাও খেলেছিল, তার তুলনা নেই।

সেন্টার ফরোয়ার্ড ধনরাজ বাকী চারজনের সমান ছিলনা। তবে তখনকার মেওয়ালাল বা এখনকার অনেক নামী ফরোয়ার্ডের চেয়ে ও ভালো খেলত। ধনরাজ শচীন দেব বর্মণের কাছে গান শিখত। বিভিন্ন ট্যুরে গান গেয়ে এবং হৈ চৈ করে আসর জমিয়ে রাখত।

লেফট্ ইন আমেদ খানকে আমি ছাড়া আর কেউ সামলাতে পারত না। এখনতো শুনি বড় বড় প্লেয়াররা সত্তর-আশীটা টিকিট নেয়। তখন ইষ্টবেঙ্গলের সব প্লেয়ারই তিনটি করে টিকিট পেত। একবার ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের ঘণ্টা দেড়েক আগে টেন্টে গিয়ে শুনি, কেউ তৈরি হচ্ছেনা। ব্যাপারটা কি? বেশী টিকিট না দেবার প্রতিবাদে স্ট্রাইক! নেতা আমেদ খান। ও নাকি সবাইকে বারণ করেছে তৈরী হতে। আমি আমেদকে ডেকে বললাম, "বাথরুমে যাবে, ড্রেস করবে, সময় কোথায়? যাও, তৈরি হও।" আমি জানতাম, আমার সামনে ও কিছু বলতে পারবে না। আমেদ থমথমে মুখ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। বাকী প্লেয়াররা, তাদের লীডারের এই দশা দেখে মুচকি হেসে তৈরি হতে শুরু করল।

সালেকে প্রথম যখন দেখি তখন ও আঠারো বছরের বাচ্চা ছেলে। ত্রিবান্দ্রমে ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ওর কাট করে ভেতরে ঢোকার কায়দা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

১৯৪৯-এর শীল্ড ফাইনালের প্রথম দিন গোল করার দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করায় খেলা ড্র হয়। খেলার পর মোহনবাগান টেন্টে ইষ্টবেঙ্গলের প্লেয়াররা লেমনেড খাচ্ছে, তখন শ্রীবলাই দাস চ্যাটার্জি সালেকে বললেন, "আজ তোমার জন্য ইষ্টবেঙ্গল জিততে পারল না।" টেন্টে ফিরে শুনলাম, সালে একলা বসে কাঁদছে। কী ব্যাপার? শ্রীবলাইদাস চ্যাটার্জির ঐ কথাই নাকি কান্নার কারণ। আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, "গোল মিস করেছিস তো কি হয়েছে? কাল তোর গোলেই ইষ্টবেঙ্গল জিতবে

পরের দিন খেলা শুরুর সময় আমি গ্যালারিতে আমার নির্দিষ্ট জায়গায় বসার জন্য উঠছি, হঠাৎ বিরাট চীৎকার। কী হোল? গোল। কে করল? সালে! আমার কথা তাহলে মিলে গেল, এই ভাবতে ভাবতে বসতে যাচ্ছি, আবার চীৎকার। আবার গোল। এবং আবার সালে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'গোল। আমার দুঃখ হল এই ভেবে যে এমন জিনিস মাঠে থেকেও আমি দেখতে পেলামনা।

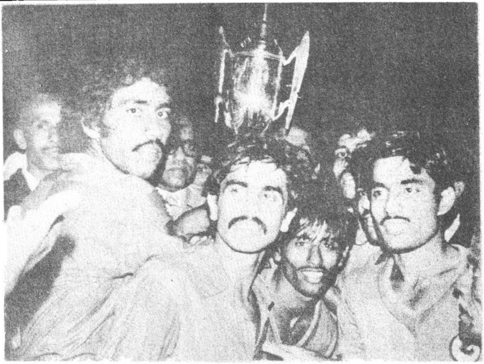
এখনও মাঝে মাঝে আমি এই পাঁচজনের কথা ভাবি। এদের মধ্যে একজনের কথা ভাবলেই বাকী চারজনের ছবি মনে আসে। এরা খেলেছে একসঙ্গে। আর আমার মনে বেঁচেও আছে একই সঙ্গে!



ছবিটি অস্পষ্ট, তবু কী অসাধারণ! সেদিন বিকেলে আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। কিছু বৃষ্টি হয়ে গেছে। পায়ের নীচে কাদা; তবু মনের সুখে নাচছেন প্রবীন রামবাহাদুর এবং তরুণ শ্যাম থাপা। কারণ, সেই দিনই ১৯৬৬ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন হল ইষ্টবেঙ্গল।

ফেডারেশন কাপে

সরোজ চক্রবর্ত্তী



ফেডারেশন কাপ ঘিরে (বাঁদিক থেকে) প্রশান্ত ব্যানার্জি, সত্যজিৎ মিত্র, বিদেশ বসু, প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

উনিশে এপ্রিল কোয়েম্বাটোরে যখন পা রাখলাম, এক স্কুটার চালক খবরটা দিলেন—ইস্টবেঙ্গলের খেলা একদিন পিছিয়ে গেছে। অর্থাৎ ২০ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গল প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে রাজস্থান পুলিশের বিরুদ্ধে খেলবে (৫-০)। সকালেই ট্রেন ঢুকেছিল কোয়েম্বাটোরে। সেই স্কুটার চালককে ফেডারেশন কাপ খেলার মাঠে যেতে বললাম। মাঠে তখন চারজন লোক জল ছেটাচ্ছিল। ওদের কাছেই ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের হোটেলের ঠিকানা পেলাম। প্রথমে 'শ্রীমুরুগন' হোটেলে গিয়ে দেখি সুভাষ ভৌমিকের ছোট্ট দুধের ছেলেটি সবুজ মেরুন শিবিরকে গরম করে রেখেছে। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, একটা ছোট্ট শিশুর হাঁটাচলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঘা বাঘা ফুটবলাররা শিশুর মতো খেলা করছে। ইস্টবেঙ্গল শিবিরে সুরজিৎ তখন নিজের ঘরে গান গাইছে। শ্রোতা হল চিন্ময় ও ভাস্কর, আমি যেতেই সুরজিৎ গান থামালো। পাশের রুমে শ্যামল, পিন্টুরা তখন তাস খেলাতে মশগুল।

ইস্টবেঙ্গল প্রথম খেলা থেকেই ফেবারিট হয়ে গেল। বিশেষ করে ভাস্কর, সুরজিৎ ও উলগানাথন। পরের খেলাগুলোতে মফৎলালকে (২-১) আই টি আইকে (২-০) ভালো খেলে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলো। সেমিফাইনালে জে সি টির বিরুদ্ধে খেলার দিন ঘরোয়া মিটিং-এ পিন্টু চৌধুরী সবাইকে প্রতিজ্ঞা করালো, 'দিল্লীর জবাব আমাদের দিতে হবে, আমি বুড়ো হয়ে যদি খেলতে পারি তোরা কেন পারবি না।' শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল অতি সহজেই জে সি-টি কে (১-০, ২-০) নাজেহাল করল।

মোহনবাগানও কম জনপ্রিয় ছিল না। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে তিনটি খেলার মধ্যে দুটিতে ড্র করে বসলো প্রিমিয়ার টায়ার্স (০-০) আর জে সি টির (১-১) বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় খেলায় প্রথম থেকেই জে সি টি মারমুখী আক্রমণ চালায়। বোম্বাইয়ের একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, "এ ঘটনার সূত্রপাত প্রভিনসিয়াল ক্লিনিংস থেকে"। মোহনবাগানের দোষ কিন্তু বেশী কিছু ছিল না। এমনকি একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাবকে পুলিশের দোরগোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় হাস্যকর যুক্তিতে। মোহনবাগান সেই থেকে অনেকটা গুটিয়ে যায়। প্রসূন, প্রদীপ চৌধুরী, পি কে-র সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, অযথা হয়রানিতে দলের মানসিক ক্ষতি হয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মধ্যে মাঝে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছিনা। তবে তারই জের টেনে প্রথম ফাইনালের আগের দিন পি কে ফোন করে অরুণ ঘোষকে বললেন, 'বাংলার সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমাদের একসঙ্গে বসা উচিত যাতে দুদলের মধ্যে ঝগড়া না হয়'। এই কথার উত্তরে অরুণ ঘোষ শান্তস্বরে বলেন, আমার খেলোয়াড়দের জন্য চিন্তা নেই।

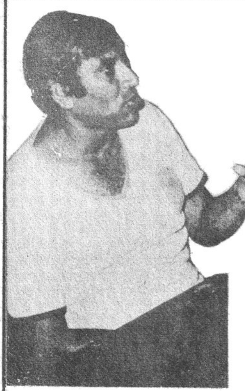
প্রথম ফাইনাল ড্র হওয়ার পর দুই দল আর খেলতে চাইছিল না। এদিকে রাজ্যপাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য আধঘন্টার মতো অপেক্ষা করে চলে গেলেন। কর্মকর্ত্তাদের সব রাগগিয়ে পড়ল দু-দলের উপর। ম্যানেজারদ্বয় ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলেন। পি কে বললেন আমরা খেলবো না; ওদিকে সুরজিৎও খেলতে চাইছেনা। কিন্তু এই বক্তব্য নিয়ে মোহনবাগানের ম্যানেজার সুশীল গুহ যখন অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ভিটল এবং সেক্রেটারি বিজয়রঙ্গমকে বলতে গেলেন, ওরা মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন, 'আপনাদের কোচ বললেন খেলবো, আপনি আবার কি বলছেন? অগত্যা সুশীলবাবু সম্মতি জানিয়ে চলে এসেছিলেন। বিজয়রঙ্গমকে প্রশ্ন করলাম, যদি দুই দল দ্বিতীয় ফাইনাল খেলতে রাজী না হয়? বিজয়রঙ্গম চাপাস্বরে বললেন "এটা এ আই এফ এফ-এর টুর্ণামেন্ট। প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি!" হয়ত এই ভয়ে ইস্টবেঙ্গলও (সাবিবের কথা মনে রেখে) সায় দিয়েছিলেন। এখনকার দর্শকেরা ভাবলেন, সবার যোগসাজসে খেলা ড্র করানো হয়েছে। খেলার শেষে লোকেরা নানারকম প্রশ্ন করলেন। বোঝালাম, ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান খেলা 'সেট-আপ' হয় না।

ফেডারেশন কাপে রেফারিং-এর মান ছিল অস্বাভাবিক নিচু। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের যেভাবে মুড়ি-মুড়কির মতো হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে (বিশেষতঃ সুরজিৎ ও প্রসূনের ক্ষেত্রে) তাতে ওখানকার দর্শকরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

কলকাতার কোন্ ফুটবলাররা ভাল খেলেছেন? ইস্টবেঙ্গলের সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দারুণ খেলেছে। ভাস্কর, শ্যামল ঘোষ, চিন্ময় চ্যাটার্জি, পিন্টু চৌধুরী আর প্রশান্ত ব্যানার্জিও আগাগোড়া ফর্ম বজায় রেখেছে। সত্যজিৎ মিত্র মনে হয় শ্যামল ব্যানার্জির অভাব বুঝতে দেবে না।

মোহনবাগানের পক্ষে ভাল খেলেছে মানস ভট্টাচার্য, সুভাষ ভৌমিক, প্রসূন ব্যানার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য্য এবং দিলীপ পালিত।

একটা খবর দিয়ে লেখা শেষ করব। তামিলনাড়ুর নাইজিরিয়ান স্ট্রাইকার ডেভিড উইলিয়ামসন জানাল: হয়ত কলকাতায় খেলব। কিন্তু কোন দলে? আমি তো দেখলাম মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল—দুই দলের কর্মকর্তার সঙ্গেই সমান অন্তরঙ্গতায় কথা বলছে ডেভিড উইলিয়ামসন।



মোহনবাগান টেণ্টে একদিন সকালে

বিশেষ প্রতিনিধি

২৬ মে রাত্রে আমাদের ফোটোগ্রাফার হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালেন : অসম্ভব। মোহনবাগান টেণ্টে ছবি তোলা যাচ্ছেনা। মোহনবাগানের প্লেয়াররা রিপোর্টার এবং ফোটোগ্রাফারদের বয়কট করছে।

ব্যাপারটা বোঝবার জন্য ২৭ তারিখ সকাল সাতটায় মোহনবাগান টেণ্টে যেতেই জানা গেল, এক বিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিকে ফুটবলারদের টাকা পয়সা নেওয়া সম্পর্কে যে লেখা দুটি বেরিয়েছে — তারই জবাবে এই সিদ্ধান্ত। ফোটোগ্রাফাররা চেষ্টা করলেন দু'একটা ছবি তোলার। পারলেন না।

প্রথমে বিদেশ বসু : "প্লিজ ছবি তুলবেন না। সিনিয়াররা বারণ করেছে। প্লিজ।"

শ্যাম থাপা : "একটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। বাড়িতে এলে কোন অসুবিধে নেই। তবে এখানে ছবি তোলা যাবে না। প্লিজ, ডোণ্ট মিসআণ্ডারষ্ট্যাণ্ড।"

হাবিব : "নো কো-অপারেশন উইথ প্রেস। কোনো পারসোনাল রাগের ব্যাপার না। এটা আমাদের ডিসিশন।"

সুভাষ ভৌমিক : "ভাল খেললেই হোল। কোথায় ছবি বেরোল না বেরোল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

সুব্রত ভট্টাচার্য : কোনো ঝামেলার মধ্যে আমি আজকাল থাকতে চাই না। কিন্তু আমাদের পিছনে লেগে কি লাভ হয়? সিনিয়র প্লেয়াররা একটা ডিসিশন দিয়েছেন। আমরা মানবই তা।"

এই সব কথা ফোটোগ্রাফারদের বলা হোল। ব্যাপারটা ভালমত বোঝার জন্য বসলাম এবারের ক্যাপ্টেন প্রসূন ব্যানার্জির মুখোমুখি। যা কথা হোল তুলে দিচ্ছি।

প্রতিনিধি : কেন এই সিদ্ধান্ত?

প্রসূন : অমন ফেমাস একটা কাগজে ফুটবলারদের বিরুদ্ধে এমন সব 'মোটিভেটেড' লেখা না লিখলে কি চলতনা? এব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে সিনিয়ররা। আমরা ওদের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছি। জানেন, সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হাবিবদা। হাবিবদাকে জীবনে দেখিনি কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে। সেই হাবিবদাই গতকাল ফোটোগ্রাফারদের সরাসরি রিফিউজ করেছে।

প্রতিনিধি : মানলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি সবসময় প্লেয়ারদের দিকেই থাকতে চাই। কিন্তু প্রেস বয়কট করার ব্যাপারটা হঠকারিতা হয়ে যাচ্ছেনা?

প্রসূন : হতে পারে। কিন্তু এটাই আপাতত মোহনবাগান ফুটবলারদের সিদ্ধান্ত। ব্যক্তিগতভাবে জার্নালিষ্ট বা ফোটোগ্রাফারদের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলবনা। কিন্তু এই ধরণের ক্ষতিকর লেখা যদি ছাপা হয়, তাহলে ভাল সম্পর্ক থাকা কি কঠিন হয়ে যায় না?

প্রতিনিধি : আমার অবশ্য মনে হয় তোমাদের এই সিদ্ধান্ত একান্তই সাময়িক। আশা করি—

প্রসূন : আমরাও আশা করি এই পরিবেশ থাকবে না। আমরা ফুটবল প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন গড়ার দিকে এগোচ্ছি। ইন্দর সিংকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। সুরজিতের সঙ্গেও দু'একদিনের মধ্যেই কথা বলব।

প্রতিনিধি : সেক্ষেত্রেও প্রেসের সহায়তা দরকার।

প্রসূন : ঠিক। কিন্তু—

কিন্তু ততক্ষণে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। পি কে এবং তাঁর টীম প্র্যাকটিসের জন্য মাঠে। আমরা বেড়িয়ে এলাম।

প্রশ্ন

১। কোন্ ক্রিকেটার ভারত এবং ইংল্যাণ্ড—দুই দেশের হয়েই টেষ্টম্যাচ খেলেছেন?

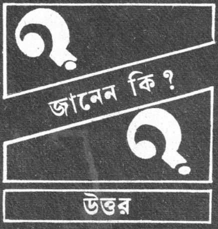
২। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভারতের একমাত্র গোলটি কে করেছিলেন?

৩। ওয়েট লিফটিং-এর ফেদার ওয়েট বিভাগে এমন কেউ কি নাম দিতে পারেন, যার ওজন ৬২ কিলোগ্রাম?

৪। টেষ্টম্যাচের পাঁচ দিনই কোনো না কোনো সময়ে ব্যাট করেছেন—এমন ক্রিকেটার কতজন আছেন?

৫। একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে, কোন্ অবস্থায় পিচে জল ঢালা চলতে পারে?

৬। অন্য রাজ্যের কোন্ ফুটবলার কলকাতায় প্রথম বছরেই 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিলেন?



উত্তর

১। ইফতিকার আলিখান, পতৌদি

২। বলরাম।

৩। না। ওজন ৬০ কিলোগ্রামের বেশী হলে ফেদার ওয়েট বিভাগে থাকা যায় না।

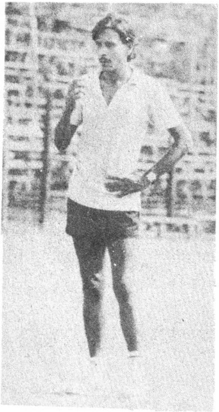
৪। দুইজন। ভারতের জয়সীমা এবং ইংল্যাণ্ডের বয়কট।

৫। কোনো অবস্থাতেই না।

৬। নঈম।

বিপ্লব দাশগুপ্ত

ইস্টবেঙ্গল মাঠে সেইদিন সকালে
বিশেষ প্রতিনিধি



অরুণ ঘোষ।

মোহনবাগান টেন্ট থেকে বেরিয়েই আমাদের ফোটোগ্রাফার ধুয়ো তুললেন : ইস্টবেঙ্গল মাঠে গিয়ে কিছু ছবি নিয়ে আসি। বললাম : "খেলার কথার প্রথম সংখ্যাতেইতো 'ইস্টবেঙ্গল টেন্টে একদিন সকালে' বেরিয়েছে। আবার ?"

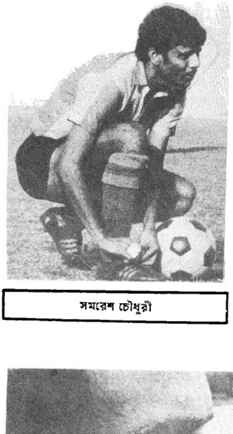
ফোটোগ্রাফারের হাত নিশপিশ করছিল। বেচারী সকাল থেকে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরছে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল মাঠে।

তখন প্রায় আটটা। প্র্যাকটিস পুরোদমে চলছে। সাদা গেঞ্জী গায়ে অরুন ঘোষ তখন মিহির বসুকে শেখাচ্ছেন কী করে নিখুঁৎ হেড নিয়ে গোল করতে হয়। মিহির ক্রমশঃ ভালোই স্পট জাম্প নিচ্ছিল। তাহলে কি বড় খেলায় মিহির এবার মাথায় ভেল্কি দেখাবে ? অবশ্য মিহির মনে রাখলে ভালো করবে, ওপর দিয়ে শিবাজীকে হার মানানো সহজ কথা নয়।

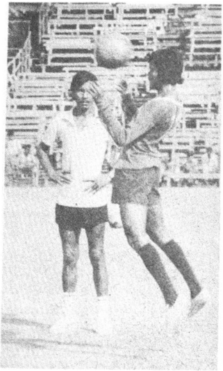
সুরজিৎ আসেনি পায়ে প্লাস্টার থাকায়। অশোক চন্দকে প্র্যাকটিসেই উৎসাহ দিচ্ছিল গ্যালারিতে হাজির কিছু সমর্থক। উলাগার ফর্ম যাতে ফিরে আসে সেজন্য অরুণ ঘোষ খাটছেন। মাঝেমধ্যে উলাগা অবশ্য ঠিকই চমক দেখাচ্ছে।

তপন দাস যেভাবে বল ঠেলছে এবং জায়গা নিচ্ছে আর রঞ্জিতকে যে রকম ফিট মনে হোল, তাতে স্ট্রাইকারের সমস্যা মিটে যেতে পারে। কিন্তু অবাক করছে সাবির। ও জানে না, আদৌ খেলতে পারবে কিনা, তবু প্র্যাকটিসে ঘাটতি নেই। একটু আধটু বাংলা শিখেছে। ছটপটে। জায়গা নেয় চমৎকার। আর হেড-ওয়ার্ক ? জবাব নেই।

তরুণ বসু এবং ভাস্কর গাঙ্গুলী —দুজনকেই



সমরেশ চৌধুরী

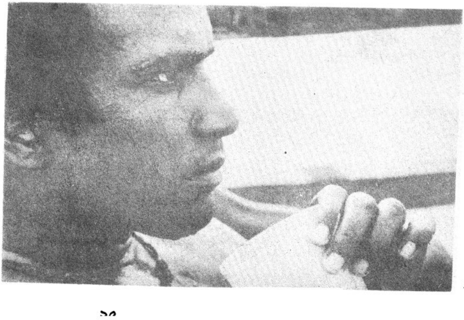


অরুণ ঘোষের নির্দেশে হেড নিচ্ছে তপন দাস

খুব খুশি-খুশি মনে হোল। ভাস্কর চুটিয়ে খেলছে। কিন্তু তরুণ বসুর ফিটনেস দেখে কে বলবে ও আর একটু হলে রিটায়ার করছিল ?

চিন্ময় চ্যাটার্জি এখন ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির আইডল। প্র্যাকটিস দেখে মনে হয়, এ বছর কড়া ট্যাকলিং-এর দিকে একটু নজর দিয়েছে। সত্যজিৎ মিত্র আর রবীন দাস দুজনেই লড়ছে। অবশ্য ফেডারেশন কাপে দারুন খেলে সত্যজিৎ এখন খানিকটা এগিয়ে।

শ্যামল ঘোষের খেলা এখন পরিণত। যেন





তরুণ বসু

কোনো তাড়াহুড়ো নেই। বড় ম্যাচের রাজা শ্যামল ঘোষের পাশে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবার সমান তেজী। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই মনোরঞ্জনকেই এবার প্রথম দিকে ইস্টবেঙ্গল রাখতে চায়নি।

পিন্টু চৌধুরীর ডিফেন্স-চেরা পাস প্র্যাকটিসেও চোখ ধাঁধাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বল পিন্টুর চাকর। যেমন খুশি তেমনি চালায়। প্রশান্ত খুব খাটছে। গৌতম - প্রসূনের পাশে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় প্রশান্ত ব্যানার্জি। চেষ্টায় অন্ততঃ ফাঁকি নেই।



শ্যামল ঘোষ



প্রশান্ত ব্যানার্জি



বিশ্ব কাপ '৫০ ও '৫৪

সেই বিকেলেই আর এক মাঠে উরুগুয়ে খেললো স্পেনের সঙ্গে। ফাউল আর অখেলোয়াড়ী নানান দুর্ঘটনায় কলঙ্কিত বিশ্রী খেলা। উরুগুয়ের আগের দিনের ফর্ম অদৃশ্য। প্রথমে এক গোল দিলেও স্প্যানিয়ার্ডরা পর পর দিলো দুই গোল। খেলা শেষের আঠার মিনিট আগে উরুগুয়ের অধিনায়ক ভেরেলা একক প্রচেষ্টায় শোধ দিলেন গোল। ব্রাজিল এবার খেললো স্পেনের সঙ্গে। ৬-১ গোল খেল স্পেন।

সুইডেনের বিরুদ্ধে কোনোরকমে ৩-১ গোলে জিতল উরুগুয়ে।

লীগ প্রথার খেলা, ফাইনাল বলে কিছুই নেই। তবু উরুগুয়ে আর ব্রাজিলের খেলাই বলতে গেলে ফাইনাল। ১৬ জুলাই, মারাকানা। ব্রাজিলের দর যাচ্ছে ২০-১। দুলাখের বেশী লোক ঢুকে পড়েছেন মারাকানায়। আনন্দে ঝলমল করছে স্টেডিয়াম।

খেলা শুরু হোল। একটু যেন রক্ষণাত্মক খেলা দুদলেরই, যেন শক্তির যাচাই করছে দু পক্ষ। বিরতির পর দু মিনিটের মাথায় গগনভেদী গর্জন উঠলো—ব্রাজিলের রাইট আউট ফ্রিয়াকা গোল করেছেন। লক্ষ লক্ষ দর্শক সমর্থকের চীৎকারে মারাকানা নদীর স্রোত থমকে গেল। গোলের ভেতর থেকে বল বের করে এনে সেন্টারে বসালেন নতমস্তক উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা। তীব্র গতিতে খেলা চলছে। হঠাৎ ১৮ মিনিট পর স্টেডিয়াম স্তব্ধ হ'য়ে গেল, শিয়াফিনো গোল শোধ করে দিয়েছেন। উভয় পক্ষই জীবনমরণ সংগ্রাম করছেন। খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ঘড়ি দেখছেন রেফারী। সহসা প্রায় ৮০ মিনিটের মাথায় মৃত্যুর নৈঃশব্দ নেমে এলো চারিদিকে—উরুগুয়ের লেফট ইন ঘিনিয়া অনবদ্য একটি গোল করলেন।

বজ্রাহত দর্শকরা নিঃশব্দে বসে রইলেন মাঠে। ১৯৫০-এর বিশ্বকাপে চূড়ান্তভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলো উরুগুয়ে—দ্বিতীয়বার বিজয়ী হোল তারা।

উনিশশো চুয়ান্নর আসর বসল সুইজারল্যাণ্ডে। লাল জার্সি ঝলমলিয়ে এল দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরি। সকলেই মনে মনে মেনে নিলেন: এবারের বিশ্বকাপ আছে হাঙ্গেরির জন্য। শুধু তুলে নেবার অপেক্ষা। বাহান্ন মাসে অপরাজিত এই সেই হাঙ্গেরি দল—পুসকাস, বুদাই, বোজসিক আর হিদেকুটির মতো তারকারা যেখানে ঝলমল করছে। এর আগের নভেম্বরে স্বদেশের মাটিতে একশো বছরে অপরাজিত ইংল্যাণ্ডকে কচুকাটা করেছে হাঙ্গেরি।

চারটি গ্রুপের প্রথম দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে এল। প্রথম গ্রুপ থেকে উঠল ব্রাজিল এবং যুগোস্লাভিয়া। দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে হাঙ্গেরি এবং পশ্চিম জার্মানি। পুলের দুটি ম্যাচে হাঙ্গেরি দিল ১৭ গোল। কোজিস একা করলেন সাত গোল।

তৃতীয় পুল থেকে উঠে এল উরুগুয়ে আর অস্ট্রিয়া। চতুর্থ পুল থেকে ইংল্যাণ্ড এবং ইতালি।

সেমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী অস্ট্রিয়াকে কচুকাটা করল (৬-১)।

হাঙ্গেরি ফাইনালে উঠল উরুগুয়েকে হারিয়ে (৪-২)। এই ম্যাচেও দুই গোল দিয়ে চুয়ান্নর বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচে কোজিসের মোট ৯ গোল হল।

এবার ফাইনাল। পুসকাস আহত, খুব ভাল খেলছেন না। তবু হাঙ্গেরি ফেভারিট, হট ফেভারিট। পুলম্যাচে হাঙ্গেরি জার্মানিকে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়েছিল ৮-৩ গোল দিয়ে।

খেলা শুরু হতে হতেই পুসকাস আর জিবরের গোলে ২-০ এগিয়ে গেল হাঙ্গেরি। হাতের মুঠোয়—বিশ্বকাপ। তবু ফসকে গেল। এক অবিস্মরণীয় "ফাইট ব্যাক" জার্মানিকে একে একে তিনটি গোল এনে দিল। তার সঙ্গে বিশ্বকাপ।

খেলা শেষের পাঁচ মিনিট আগে টথের পা থেকে বল পেয়েই ঝলসে উঠল ফেরেঙ্ক পুসকাসের বিখ্যাত বাঁ পা—গোল? না, অফসাইড।

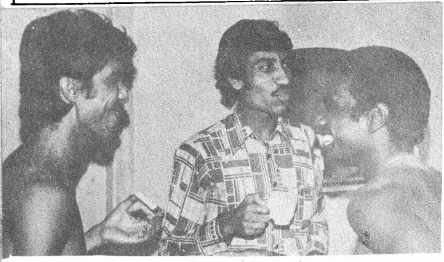
পুসকাস আত্মজীবনীতে বলেছেন: "ওটা গোল ছিল। পরিষ্কার গোল।"

আমরা অবশ্য একটি কথা নিশ্চিত বলতে পারি। চুয়ান্নর বিশ্বকাপ হাঙ্গেরি পায়নি। কিন্তু ভাবীকালের সামনে একটি প্রাসাদের দরজা ওরা খুলে দিয়ে গেছে—যার নাম আধুনিক ফুটবল।

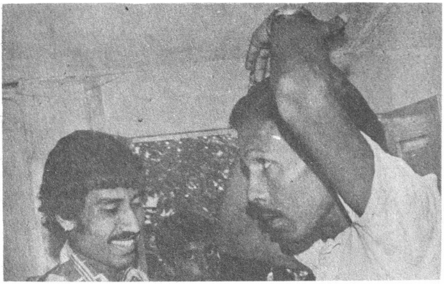
ইস্টবেঙ্গল টেণ্টে একজন অতিথি



৩ জুন সকাল সাতটায় ইস্টবেঙ্গল টেন্টে এল প্রসুন ব্যানার্জি



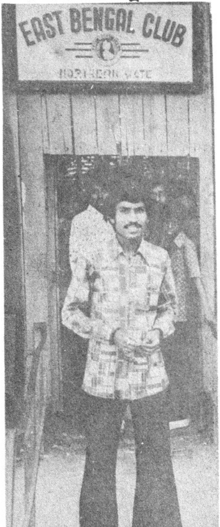
সুরজিৎ আর প্রসনকে নিয়ে একটা দারুণ ঠাট্টা করছে উলাগা—প্রসুন শুনেও শুনছে না।



টেন্টে ঢুকেই দেখল চুল আঁচড়াচ্ছেন অরুণ ঘোষ



ব্যক্তিগত কথাবার্তা বন্ধু বিশুর সাথে



কথা শেষ। প্রসুন বেরিয়ে এল ইস্টবেঙ্গল টেন্ট থেকে।

বিশ্বকাপ ঃ ১৯৭৪

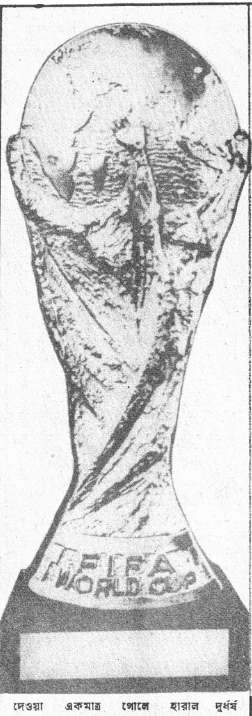
মতীশ ব্যানার্জ্জি

জুল রিমে কাপ ব্রাজিল তুলে নিয়েছিল ১৯৭০-এ। ১৯৭৪-এ এল ফিফা ওয়ার্লড কাপ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা পশ্চিম জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ৭৪-এর বিশ্ব কাপ পৃথিবীর ফুটবলের সামনে খুলে দিল এক নতুন দরজা—আমরা পেলাম 'টোটাল ফুটবল।' ৯ জন অ্যাজাক্সের ফুটবলার-সমৃদ্ধ হল্যাণ্ড দেখাল ফুটবল আগামী বছরগুলিতে কীভাবে খেলতে হবে। সুপার টীম হল্যাণ্ড, তাদের সুপার ফুটবলার জোহান ক্রুয়েফ। কিন্তু এই দলটি বিশ্ব কাপ জিতে নিতে পারল না। কিন্তু পরের কথা পরে ;

সাতটি শহরের নয়টি স্টেডিয়ামে ষোলটি সেরা দলকে নিয়ে শুরু হল বিশ্ব কাপ। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত লড়াই-এ এল পশ্চিম জার্মানি, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড এবং ব্রাজিল। সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানি গার্ড মূলারের



ভিগুফিলো - কুবিল্লাস (পেরু)।



দেওয়া একমাত্র গোলে হারাল দুর্ধর্ষ পোল্যাণ্ডকে। এই ম্যাচে নিঃসন্দেহে জিতে যেত পোল্যাণ্ড—যদি না শেপ মায়ার গোলকীপিং-কে পৌঁছে দিতেন অলৌকিকতার স্তরে।

ফাইনালে যাবার জন্য হল্যাণ্ডকে লড়তে হল ব্রাজিলের সঙ্গে। আট বছরে অনেকখানি মুছে গেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের ঝলমলানি—ব্রাজিল হারল ২-০ গোলে।

হল্যাণ্ড ফাইনালে পৌঁছেছিল টোটাল ফুটবলের ঝড়ে সব প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে। পশ্চিম জার্মানি উঠেছিল কোনো-গতিকে, লড়তে লড়তে।

একমাত্র দেশপ্রেমিক জার্মানরা ছাড়া কেউই ভাবেনি বিশ্ব কাপ হল্যাণ্ড ছাড়া আর কেউ নিতে পারে।

ফাইনাল খেলা শুরুর দ্বিতীয় মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল (নিসকেন্স) পেয়ে এগিয়ে গেল হল্যাণ্ড। কুড়ি মিনিট সময় লাগল জার্মানির রুখে দাঁড়াতে। পেনাল্টি থেকেই গোল শোধ করলেন ব্রাইটনার। ধীরে ধীরে খেলা চলে এল পশ্চিম জার্মানির হাতে।



জোহান ক্রুয়েফ

ডাচ অধিনায়ক ক্রুয়েফ মাথা গরম করে হলুদ কার্ড দেখলেন আর জার্মান অধিনায়ক বেকেনবাউয়ার ঠাণ্ডা মাথায় খেললেন অবিস্মরণীয় ফুটবল। খেলা শেষ হবার কুড়ি মিনিট আগে গোলের রাজা মুলারের গোলে জার্মানি এগিয়ে গেল। ক্রুয়েফ আপ্রাণ লড়েও আর কিছু করতে পারলেননা।

বেকেনবাউয়ার, শেপ মায়ার আর মুলারের কৃতিত্বে বিশ্ব কাপ জয় করল হেলমুট শ্যোনের পশ্চিম জার্মানি। কিন্তু সমবেত ফুটবল-যোদ্ধারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন একটি কথা ঃ "হল্যাণ্ড দেখিয়ে গেল আগামী দিনের ফুটবলের ধারা কোন খাতে বইবে।

Germany FR

তিন প্রধানের বাইরে

বিপ্লব দাশগুপ্ত

আসলে এখন দুই প্রধান। তবু মহামেডান স্পোর্টিংকে নিয়ে তিন প্রধান বলাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই উনিশশো সাতষট্টিতে জ নের নেতৃত্বে লীগ পেয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং, তারপর থেকে চ্যাম্পিয়ানশীপের ধারে কাছে নেই।

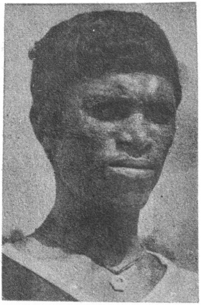
এই তিন প্রধান বাদে আরও কুড়িটি দল কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল লীগে খেলে। এদের ঢাক কেউ পেটায় না। এরা সব হরিণ শিশু, বড় টীমের গোলশিকারীরা এদের হেনস্থা করলে মাঠভর্তি দর্শকের হাসি আর ধরে না। অথচ কত লড়াই করে টিকে আছে এই দলগুলো, তার খবর রাখা কেউ দরকার মনে করে না।

কিন্তু এত রমরমা সত্ত্বেও ময়দানের তিন প্রধান বিলক্ষণ ডরায় অন্তত তিন অপ্রধানকে—এরিয়ান, জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এবং খিদিরপুর। এদের সঙ্গে খেলার আগে বড় দলের কর্মকর্তাদের চিন্তা বাড়ে। দল বদলের সময় এই দলগুলির উঠতি তারকাদের দিকে নজর পড়ে বেশী।

এরিয়ান একদা ছিল প্রথম সারিতে। এখনও এই দল বছর বছর বড় ফুটবলার উপহার দেয়। শচীন হালদারের তালিম নিয়ে এবারের এরিয়ানও লড়বে প্রাণপণ। নাসিম আলি, লক্ষ্মণ বেলেল, সমীর মুখার্জি আর তপন দাস চলে গেছে বড় ক্লাবে। এইভাবেই চলে যায় প্রতি বছর। তবু এরিয়ান দুর্বল হয় না। নতুন মুখ ঠিকই এসে যায়।

এবারের জর্জ্জ টেলিগ্রাফ টীমে প্রবীন আর নবীনের মোক্ষম কম্বিনেশন। একদিকে প্রদীপ দত্ত, রতন দত্ত, শিবব্রত নাথ আর নিমাই গোস্বামীর মত অভিজ্ঞ ফুটবলার। অন্যদিকে তেজী তরুণ অমিত গুহ আর স্বপন দাস। কোচ শান্ত মিত্র আশা করছেন, টীম ভাল খেলবেই।

খিদিরপুরের কোচ এবারও সেই অচ্যুত ব্যানার্জি। তরুণ মুখিয়া দল ছেড়েছে, কিন্তু বাকী প্রায় সবাই থেকে গেছে।



কালিপদ হালদার (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)

ময়দানের বাকী সতেরোটী ফার্স্ট ডিভিসন টীমের কোচ হলেন :

শঙ্কর সরকার (ইষ্টার্ণ রেলওয়ে), বলরাম (বি, এন, আর), নিখিল নন্দী (চন্দ্র মেমোরিয়াল), সুনীল নন্দী (পোর্ট ট্রাষ্ট), এম মুৎসুদ্দি (কালীঘাট), সাত্তার (হাওড়া ইউনিয়ন), ফেন (রাজস্থান), তপন মিত্র (উয়াড়ি), অমৃত চক্রবর্তী (টালিগঞ্জ অগ্রগামী), অশোক নাগ (সালকিয়া ফ্রেণ্ডস), পিয়ার আলি (ক্যালকাটা জিমখানা), দেবু ঘোষ (বাটা), আশীষ চ্যাটার্জী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), পশুপতি ভট্টাচার্য (কুমারটুলি), সত্য সোম (পুলিশ), স্বরাজ ঘোষ (ইষ্টার্ণ কমাণ্ড) এবং সমর বিশ্বাস (ভ্রাতৃ সংঘ)।

অমল দত্ত ময়দানে ফিরলেন

কী করছেন এখন অমল দত্ত? অমল দত্ত এখন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কোচ। ৮ জুন সকাল থেকেই এই দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন।

বিশ্বকাপে গোলের রাজা

নাম	বছর	দেশ	গোলসংখ্যা
স্ট্যাবিল	১৯৩০	আর্জেন্টিনা	৮
সেজ্ঞেলার	১৯৩৮	হাঙ্গেরি	৭
লিওনিডাস	১৯৩৮	ব্রাজিল	৮
আদেমির	১৯৫০	ব্রাজিল	৭
কোজিস	১৯৫৪	হাঙ্গেরি	১০
মরলক	১৯৫৪	পশ্চিম জার্মানি	৬
ফনটাইন	১৯৫৮	ফ্রান্স	১৩
পেলে	১৯৫৮	ব্রাজিল	৬
ইউসেবিও	১৯৬৬	পর্তুগাল	৮
জেয়ারজিনহো	১৯৭০	ব্রাজিল	৭
গার্ড মূলার	১৯৭০	পঃ জার্মানি	১০
লাটো	১৯৭৪	পোল্যাণ্ড	৭




POLAR
পোলার
পাখার
গুণের কথা
লেখা আছে ব্যবহারকারীদের তৃপ্ত মুখে
★ কাজে মজবুত ★ দামে সস্তা
★ প্রচুর হাওয়া ★ দেখতে ভাল
★ মান উঁচু
আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ডিজাইন করা এবং তৈরি। পোলার পাখা বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী নৈপুণ্যের চরম নমুনা। সাত বছরের গ্যারান্টিযুক্ত।
প্রস্তুতকারক—
পোলার ফ্যান ইণ্ডাস্ট্রিজ • হেড অফিস :- ৫১ এজরা স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন : ৩৪-৩৩২৩/৩৪-৬৪০৫ • শাখা অফিস—বারাণসী, কানপুর, নয়া দিল্লী
অনুপ ট্রেডার্স
৪২, এন, এস, বি রোড, রাণীগঞ্জ

এটা ক্রিকেট নয়

সুরজিত বসু

দেওধর ট্রফির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম এবারের মত শেষ হল। উত্তরাঞ্চল দেওধর ট্রফি জিতল সবাইকে অবাক করে। এর আগে কর্ণাটক যোগ্য দল হিসেবে জিতে নিয়েছে রঞ্জি ট্রফি। বাংলা বা পূর্বাঞ্চল কোথাও কিছু করতে পারলনা।

পঁচিশ বছর আগেও ভারতে ক্রিকেট খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না। সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের কিছু অপ্রত্যাশিত জয় এদেশে ক্রিকেটকে প্রচণ্ড জনপ্রিয় করে দিয়েছে।

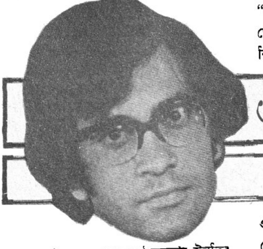
একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে, ভারতীয় ক্রিকেটের এই উত্থানের যুগে পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে বাংলার খেলোয়াড়দের অবদান কতটুকু। অম্বর রায়, আর সুব্রত গুহ এল এবং চলে গেল। তাহলে কি বুঝতে হবে বাংলার ক্রিকেটাররা যোগ্য নয়? কিন্তু স্কোর বুক অন্যকথা বলে।

বাইশ বছরের কম বয়সীদের জন্য নির্দিষ্ট সি কে নাইডু ট্রফিতে বাংলার অনায়াস জয় প্রমাণ করে যে বাংলার তরুণ ক্রিকেটাররা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

এই তো সেদিন রাজা মুখার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় স্কুল দল খেলেছে ইংল্যাণ্ডে। স্কুল ক্রিকেটার রবি ব্যানার্জী এবং দীপঙ্কর সরকার যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েই এসেছিল। অথচ ঐ সময়ের ভারতীয় স্কুল দলের অনেক ক্রিকেটারই টেস্ট দলে জায়গা করে নিয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠতেই পারে, বাংলার ক্রিকেটাররা উঠে আসতে পারছেনা কেন দোষটা কি শুধু ক্রিকেটারদের? আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমার বরং মনে হয় সবচেয়ে বেশী দায়ী কর্মকর্তারা।

গোটা দেশের ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করব না। আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব বাংলার ক্রিকেটের মধ্যে, যার সঙ্গে গত দুই দশক গভীরভাবে জড়িয়ে আছি।

যে কোন রাজ্যের কাছেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল রঞ্জি ট্রফিতে ভাল ফল করা। গত দু-বছর বাদ দিলে, নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক অনুচিত ঘটনা সত্ত্বেও বাংলার ফল গত দুই দশকে খুব খারাপ হয় নি। এর মধ্যে একাধিক বার বাংলা ফাইনালে পৌঁছেছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা ভীষণ ভাবে পিছিয়ে পড়েছে গত বছর হরিয়ানার কাছে বা এবার হায়দ্রাবাদের কাছে যেভাবে বাংলা হেরেছে তাতে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যায়। হরিয়ানার সাথে শোচনীয় পরাজয়ের পর দাবী উঠেছিল ঃ যথাযথ তদন্ত করে নতুন এক ঝাঁক ক্রিকেটার নিয়ে দল গড়তে হবে। হায়, সবই অরণ্যে রোদন! সুতরাং দোষটা বোধহয় শুধু ক্রিকেটারদের নয়।


অবহেলিত গোপাল বসু

বোঝাই যাচ্ছে বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য যে চোখের জল কর্তাদের চোখে দেখা যায়, তার অনেকটাই কুম্ভীরাশ্রু। বছর বছর ইডেনে টেস্ট ম্যাচ হলেই হল। বাংলার ক্রিকেট চুলোয় যাক্!

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলা দল গড়ার জন্য মরশুম শুরু হবার আগে জে সি মুখার্জী ট্রফি চালু করা হল। খুব ভাল সিদ্ধান্ত। কিন্তু রঞ্জি ট্রফি দল ঘোষণার সময় বোঝা গেল, ব্যাপারটা তা নয়। কারণ জে সি মুখার্জী ট্রফিতে যারা সবচেয়ে ভাল খেলেছে, বেছে বেছে তাদেরই বাদ দেওয়া হল। নির্বাচকমণ্ডলীর দু'জন বিখ্যাত সদস্যকে বাদ দিলে (ওরা অবশ্য খুব ব্যস্ত লোক, বাংলার ক্রিকেটারদের খেলা দেখার সময় নেই) বাকী সদস্যরা কি ভাবে কমিটিতে এলেন তা ঈশ্বরই জানেন!

ঐ ট্রফিতে সবচেয়ে ভাল খেলেছিল সুব্রত গুহ, প্রদীপ পাণ্ডে, দীপঙ্কর সরকার এবং ফারাসাতুল্লা। ওদের মধ্যে কেউ দলে এলনা। এমন কি গত বছরের সেরা বোলার রাজস্থানের এম দাসকে নেটে পর্যন্ত ডাকা হল না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন নিরীখে ক্রিকেটারদের নির্বাচিত করা হল? ফর্ম দেখেই যদি টীম করতে হয়, তাহলে ঐ চারজন বাদ যায় কি করে তাহলে কি নির্বাচকদের কাছ থেকে বিচারবুদ্ধির আশা করা আমরা ছেড়ে দেব?

এবার রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার শোচনীয় পরাজয়ের পর একদিনের উইলস্ ট্রফিতে বাংলা দলে কিছু নতুন মুখ দেখা গেল "খারাপ ছেলে" প্রদীপ পাণ্ডে এবং "অলস ছেলে" ফারাসাতুল্লা শেষ পর্যন্ত ডাক পেল। কিন্তু ফারাসাতুল্লাকে নেওয়া হল 'লিমিটেড ওভার ক্রিকেটের ওস্তাদ বোলার দিলীপ দোসীর জায়গায়। সুব্রত গুহকে তখনও ঠাণ্ডা ঘরে পুরে রাখা হল। ফলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই উইলস্ ট্রফি থেকে বিদায় নিয়ে বাংলা ফিরে এল।

পূর্বাঞ্চল দলে দিলীপ দোসী খেলতে পারল না ইংল্যাণ্ডে চলে যাবার জন্য। দালভিও খেলতে পারলনা আঘাতের জন্য। নির্বাচকরা ওদের দুজনের জায়গায় ডাকলেন গোপাল বসু এবং প্রবীর চেলকে। গোপালের যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু দোসীর জায়গায়তো একজন বাঁ হাতি স্পিনার নেওয়া উচিত ছিল?

সুতরাং বাংলার ক্রিকেটের মান যে নীচের দিকে যাচ্ছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। খেলোয়াড়দের নিশ্চয় আরও ভাল খেলতে হবে। কিন্তু যারা খেলা চালান, তারা কি একটু নড়ে চড়ে বসবেন না? সি এ বি'র কর্মকর্তারা কি কিছুই করতে পারেন না

খেলার টেবিল থেকে লড়ার ময়দানে

মনীশ মৌলিক

"এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। বি টি টি এ-র বহু অত্যাচার অনেকদিন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়েরা মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। ন্যাশনালস-এ বাংলার র‍্যাংক যাতে আরো উঁচুতে ওঠে সে সম্ভাবনার রঙীন স্বপ্ন দেখে তাদের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নির্দ্বিধায় আমরা জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু শেষ অবধি দেখেছি লাভের খাতায় লবডঙ্কা। শুধু বি টি টি এ-র কতগুলো অপোগন্ড কর্মকর্তা মওকামত তাদের পেয়ারের খেলোয়াড়দের গায়ে বেঙ্গল ছাপ মারা গেঞ্জি চড়িয়ে দিয়েছে। কেন কর্মকর্তারা এসব করছেন তা একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই ধরে নেবেন। কিন্তু স্টেটের লাভ? ...আগেই বলেছি কেবল র‍্যাংক লুজিং আর লবডঙ্কা" — ওয়াই. এম. সি. এ-র দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কথাগুলো বলতে বলতে নবগঠিত বেঙ্গল টেবিল টেনিস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাল এস ভানিয়া রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিটপা কেন গঠন করা হল এটা জানতে হলে অনেক পেছনের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। দেখতে হবে বি টি টি এ-র প্লেয়ার এক্সপ্লয়েট করার ইতিহাস। জাল ভানিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিল অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রতীম সেন: "টপ ফর্মে থাকা সত্ত্বেও '৬৯-এ অজিত বসু অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বেঙ্গল খেলতে পারলেন না। অজিতদার তুলনায় অনেক ইনকম্পিটেন্ট লোক দলে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল। কাজেই, হিসেব মতোই বেঙ্গল তেমন র‍্যাংকিংয়ে আসেনি। একাত্তরে আবার বি টি টি এ-র কোনো কোনো কর্মকর্তার মাথায় পোকা নড়াচড়া করে উঠল। ফল: অমৃত খোসলা, অজিত বসু, দীপক চ্যাটার্জী প্রভৃতিরা জঘন্য চক্রান্তের শিকার হলেন। এইসব খেলোয়াড়রা ছয় মাস করে সাসপেন্ড হলেন। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, সে বছরই মাইকেল মল্লিক স্টেট চ্যাম্পিয়ন হয়েও জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে লড়তে পারেনি। অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে মাইকেল দলে স্থান না পাওয়ার কারণ অজ্ঞাত থেকে যায়। উপরন্তু একটা বাজে ছুতোয় তিনমাস সাসপেন্ড করা হয় মাইকেলকে। ফলে হায়দ্রাবাদ ন্যাশনালস-এ লড়তে হল জ্ঞান মল্লিক অমিত মিত্র প্রভৃতিদের। আলাপ আলোচনায় তখনই সরগরম হয়ে উঠেছিল খেলোয়াড়েরা। নন্দন ভট্টাচার্য, অমৃত খোসলা, অজিত বসু, দেবীদাস বসু, এম জে কাপাদিয়া প্রমুখেরা তখনই চেষ্টা করেছিল খেলোয়াড়দের আলাদা একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরী করতে। কিন্তু তাইরে-নাইরে করে দেরী হতে হতে ক্রমশঃ ধামাচাপা পড়ে গেল ব্যাপারটা। গন্ডগোল আবার বাঁধল তিয়াত্তরে। জাল এস ভানিয়া বেঙ্গল নাম্বার টু হয়েও টিম থেকে আউট হয়ে গেল; ফলে মাদ্রাজ ন্যাশনলস-এ জাল ভানিয়া হল বঞ্চিত। অনেক চেষ্টা করে জালের দল থেকে বাদ পড়ার তেমন জোরদার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। তিয়াত্তর, চুয়াত্তর, পঁচাত্তরে বি টি টি এ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার দলগত দুর্দশা দেখে আর তেমন কিছু গণ্ডগোল করেনি। ফলে ইন্দোর, জয়পুরে র‍্যাংকিংয়ের তেমন দুর্দশায় বাংলাকে পড়তে হয়নি। এমন কি ছিয়াত্তরে এলাহাবাদে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা ভাল ফল করল। গত কয়েক বছর ধরেই জাতীয় আসরে যে সম্মানটুকু বাংলা ফিরে পেতে শুরু করেছিল শুধুমাত্র বি টি টি এ-র খামখেয়ালীর ফলে সাতাত্তরে গুজরাটের বল্লভ বিদ্যানগরে বাংলা করল যাচ্ছেতাই ফল। টীম থেকে কোতল করা হল নাচ্চু মুখার্জি, সাধন দত্তের মত প্রতিভাকে। কারণ সম্ভবতঃ এতটাই দুর্বল যে এখনও লিখিতভাবে সাধন দত্তের হাতে তার দল থেকে বাদ পড়ার 'রিজন' দেওয়া হয়নি। নাচ্চুকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টুর্ণামেন্টে না খেলার দোষারোপ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে তার পোটেনশিয়ালিটি কমে গেছে। নাচ্চু তার লিগামেন্ট ইন্জুরী এবং দাদার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য অনেক টুর্ণামেন্ট



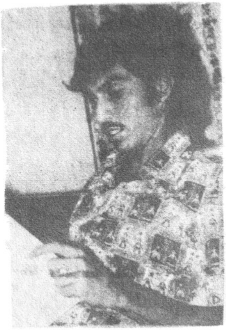
বিটপার কর্মকর্তারা

কমপ্লিট করতে পারেনি সত্য, কিন্তু বাংলা দলের যে কোন খেলোয়াড় নান্টুর খেলোয়াড়োচিত সক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।" একটানা এতখানি বলে দম নিল প্রতীম। — "এরই বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের এই সংগঠন তৈরী করা। সাতাত্তরেই ইন্ডিয়ান টেবিল টেনিস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠার ফলে আমাদের মানসিক শক্তি আরও বেড়ে যায়। তারপরে ইটপার সভাপতি মনজিত দুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বুটালিয়ার সহৃদয় সহযোগিতায় আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সাতাত্তরের অক্টোবরে সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে। অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সময় সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। খেলোয়াড়দের কাছে ক্রমশঃই অ্যাসোসিয়েশনে অন্তর্ভুক্তি তাদের পক্ষে একটা রক্ষাকবচ হিসেবে মনে হওয়ায়, এখন অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যসংখ্যা একশ পঁচাত্তরের ওপরে। বি টি টি এ-র কোন প্যারালাল অর্গানাইজেশন তৈরী করার ইচ্ছে খেলোয়াড় সংগঠনের নেই। তবে ভুল যদি বি টি টি এ করে তবে অবশ্যই তাঁরা চোখে আঙুল দিয়ে সে ভুল দেখিয়ে দেবে। খেলোয়াড় তত্ত্বাবধানও বিটপার আরেক কাজ। নতুন খেলোয়াড় তৈরী করাতেও অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা কোন খেলোয়াড়ই যেন তাঁদের পূর্বসূরীদের মত শোষিত না হয়। উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বি টি টি এ-র কর্মকর্তাদের বিষ দাঁতের কামড় ওরা সহ্য করতে পারবেতো?



মনজিৎ দুয়া

ফুটবলারের কলম



সুরজিৎ সেনগুপ্ত

জানি, আমি একটা ঝুঁকি নিচ্ছি। গোলের মুখে গিয়েও মাঝেমধ্যে রিস্ক নিতে হয়, আটকে গেলে কী আর করা যাবে। কিন্তু একজন সক্রিয় ফুটবলার হিসেবে কলম ধরার ঝুঁকি অনেক বেশী।

আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই, বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় নিজেকে বসানোর স্পর্ধা নিয়ে আসছি না। কিছুদিন ধরেই মনে হয়েছে, ফুটবলারদের নিজেদের কথা সরাসরি মাঠ থেকে বলার চেষ্টা করা যায়। এক্ষেত্রে আমাকে ফুটবলারদের একজন সাধারণ প্রতিনিধি ধরে নিতে পারেন।

আমাদের, মানে ফুটবলারদের, সম্পর্কে নানা কাগজে ভালমন্দ মিশিয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়। উৎসাহীরা তৃপ্তি পান। কিন্তু আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেও বেশ কিছু কথা বলার থেকে যায়।

যেমন ধরুন, সাবির আলির কথাটা। ছেলেটা মাসের পর মাস আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছে। টীমের সঙ্গে নানা জায়গায় যাচ্ছে। অথচ ও জানে না খেলতে পারবে কি না। এই অবস্থাতেও ওর মুখে যে হাসি ফুটে থাকে, সে ওর স্বভাবের গুণ।

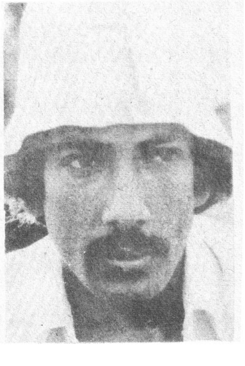
যখন এই লেখা লিখছি, তখনও পর্যন্ত সাবিরের ব্যাপারে পাকা কোনো খবর আসেনি। এই মুহূর্তে কিছু কথা মনে আসছে।

গত বছর শীল্ড ফাইনালের দিন রাত্রে আমি বোম্বে গেলাম জাম্বিয়া সফরের জন্য। সেদিন ছিল আটাশে সেপ্টেম্বর। উনত্রিশে সেপ্টেম্বর আমার সঙ্গে সাবিরের কথা হল। আমার সঙ্গে ট্রাঙ্ক কলে কথা বলে ক্লাবের তখনকার ফুটবল সম্পাদক বোম্বে এলেন। এবং সাবিরের সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তা বললেন। সাবির ফর্মে সই করল। তিরিশ তারিখেই সেই ফর্ম জমা পড়ল ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিসে।

পরে জানা গেল, ফর্ম অল ইণ্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের অফিসে জমা পড়া চাই তিরিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ফলে সাবিরের খেলা নিয়ে এই সমস্যা।

এখন কথা হল, কোথাও একটা গোলমাল নিশ্চয় হয়েছে। আইন বলে একটা কথা নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু ফুটবলার হিসেবে আমার মনে একটা প্রশ্নই জাগে: যে কারণেই হোক, একজন ফুটবলার পুরো বছর বসে থাকবে, এটা কি মন থেকে মেনে নেওয়া সম্ভব? আইন আগে না মানুষ?

একটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। এবার আমি ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন এবং সাবির খেললে আমাদের টীম ভাল হবে — সেই চিন্তায় কথাগুলি লিখিনি। সাবির বা ফ্রান্সিস ডি সূজার মতো যে কোনো ফুটবলার, ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান যে কোনো টীমেই খেলতে আসুক — সবার হয়েই বলতে চেয়েছি। দয়া করে ভুল বুঝবেন না।



সাবির আলি

বিবর্ণ বেটন ১৯৭৮

অর্ণব ঘোষ

এবারের বর্ণহীন বেটন কাপ দেখে ভারতীয় হকির দৈন্যদশাটাই বেশী করে চোখে পড়ে। হয়ত বড় দল বিশেষ কেউ এবার আসেনি, কিন্তু কিছু তো এসেছিল এবং বেশ কিছু নামী খেলোয়াড়ও তাদের সঙ্গে কিন্তু তারা কি নজীর রেখে গেল? বিহার রেজিমেন্টের ডুং ডং ও কারকেট্টাকে চিনে নিতে হয় বিদেশী স্টিক হাতে দেখে; অশোক কুমার, আসলাম শের ও গোবিন্দকে দেখলে দুঃখ হয় আমরা চেচামেচি করেছি ভারতীয় দলে এদের নেওয়ার জন্য। অবাক হতে হয় রেলের সৈয়দ আলিকে দেখলে এ আবার ভারতীয় দলে ঠাঁই পেল কি করে।

বস্তুতঃ এ সব নামী দামী খেলোয়াড়দের ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে এরা খেলতে এসেছে না কলকাতা দর্শনে বেরিয়েছে। মনে হ'ল মোহনবাগানই একটু যা সিরিয়াস। এবং সেদিক থেকে মোহনবাগানের বেটন হয় যোগ্যের সম্মান লাভই বলতে হবে।

তবু আগন্তুকদের মধ্যে এয়ারলাইন্সের সুরজিৎ সিং এর ক্রীড়াশৈলী কিছুটা নজর কাড়ে। এবং জুনিয়ার ছেলে, যেমন—গোলে অরবিন্দ হাবড়া, রাইট ইনসাইডে ববি ক্লাডিয়াসের বিশেষ বন্ধু মেরভিন ফার্ণাণ্ডেজ ও জালালুদ্দীন মনে দাগ কাটে। সত্যি বলতে কি, অশোক, গোবিন্দ, আসলাম, সুরজিৎ ও মেহেবুবের মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রিপ্লে ম্যাচে খেলা দেখলে মনে হয় এদের ভাল খেলার ইচ্ছা ছিল না। অবাক হয়ে গেলাম দেখে দ্বিতীয় পর্বের সেমিফাইনালে টাই ব্রেকারে যখন হাবড়া শেষ স্ট্রোকটা বাঁচিয়ে ৩-৩ করল, তখন একমাত্র মেরভিন ছাড়া আর কেউই দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাল না। উপরন্তু দেখা গেল, গোবিন্দ কপাল চাপড়িয়ে পেজের সঙ্গে গড়াগড়ি দিচ্ছে!

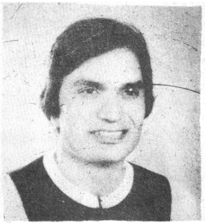
তাহলে কি এবার বেটন কিছুই দেয় নি? গতবছরে তবুও ওয়েস্টার্ণ রেলের বলবীর কিছু স্টিকওয়ার্ক দেখিয়েছিল। আর্মি সাপ্লাই কোরের ভিনসেন্ট লাকড়া ও হরচরণের কিছু ছোট কাজ, ব্যাকে ডেংরা ও গোলে ফ্রেডেরিক্‌সের অনমনীয় দৃঢ়তা চোখে পড়েছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের (দিল্লী) উদীয়মান ব্যাক সতীন্দর সিং এবং লেফট আউট এক্কাও সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। তবে মোহনবাগানের গুরুবক্স এখনও বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখাতে পারেন আর ভীন কিন্তু বহুবার স্পীডে এয়ারলাইন্স ও সি আর পি এফ্-এর রক্ষণভাগ ভেঙ্গে ছত্রখান করেছে।

তবে এ এস সি (জলন্ধর) ও সি আর পি এফ-এর দ্বিতীয় পর্বের সেমিফাইনালে হরচরণের দেওয়া গোলটাই সারা টুর্ণামেন্টে উল্লেখ করার মত। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাকড়া সপিল গতিতে একটা বল নিয়ে এসে হরচরণকে দিল শুধু ফ্লিক করে গোল করার জন্য।

ফাইনালের প্রথম পর্বটি মোটেই আকর্ষনীয় হয়ে ওঠেনি। বস্তুত এত নিম্নমানের বেটন ফাইন্যাল আমরা বহু বছর দেখিনি।

দ্বিতীয় পর্বটি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল বটে তবে খুবই সাধারণ স্তরের। হয়ত খেলার মান একটু উঠত কিন্তু আম্পায়াররা এত বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করলেন। খেলার বোধহয় তখন পাঁচ-ছ' মিনিট বাকী, এম এস মান একটি বল নিয়ে সুন্দরভাবে কাটিয়ে গোলমুখে ঢুকছেন হঠাৎ আম্পায়ার তারক সেনের বাঁশি বেজে উঠল। দিল্লীর অধিনায়ক মান আম্পায়ারের কাণ্ড দেখে বিদ্রূপে হাততালি দিয়ে উঠলেন, মোহনবাগান তখন প্রথমার্ধে ইন্দ্রজের দেওয়া গোলে জিতছে। এরই একটু পরে মোহনবাগানের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের পায়ে বল লাগে, আম্পায়ার দিল্লী দলের পেনাল্টি কর্ণারের আবেদন নাকচ করে লং কর্ণার দিলেন।

এবার কিছু প্রশ্ন। একটি বাদে আর কোন রেল বেটনে এলনা কেন? আন্তঃরেল জয়ী ইস্টার্ণ ও বি এন আর-এর তারিখ পিছানোর অনুরোধ একটু বিবেচনা করা যেত না কি? ওদের অনুরোধ যদি নাই রাখলেন বি, এইচ, এ, তাহলে সি, আর, পি, এফ এর খেলার তারিখ পয়লা মে অবধি পিছান হল কেন? এসব প্রশ্নের কি সদুত্তর দেবেন রাজ্য সংস্থার সম্পাদক মশাই? বেটনে ছটি দল নাম দিয়েও হয় আসেনি, অথবা দল ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে রেঞ্জার্স দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে একেবারে কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল।



আসলাম শের খান।

কিন্তু একটি ব্যাপারে রাজ্য সংস্থার টেক-নিক্যাল কমিটি এবং টুর্ণামেন্ট কমিটি যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে ওদের ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। মোহনবাগান - এয়ারলাইন্‌সের ফিরতি সেমিফাইনালে সাডন ডেথে ভীনের স্ট্রোক নেওয়া নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল তারই ওপর আলোকপাত করছি। ভীনের স্ট্রোক রিটেকের আদেশ দেওয়া উচিত ছিল কি না সে নিয়ে আলোচনায় নামছি না; শুধু একটা জিজ্ঞাসা — যে দল আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্য করে মাঠে বসে রইল টুর্ণামেন্ট কমিটি তাদের বিরুদ্ধে রায় না দিয়ে রিপ্লের নির্দেশ দিলেন কি হিসেবে? ঠিক এই ঘটনাই তো ঘটেছিল লীগে বেঙ্গল ইউনাইটেড — কাস্টমস্‌ ম্যাচে। খেলা গোলশূন্য চলছে, শেষ হওয়ার কিছু আগে হঠাৎ আম্পায়ার পেনাল্টি স্ট্রোকের নির্দেশ দেন। বেঙ্গল ইউনাইটেড খেলতে অস্বীকার করে, কিন্তু মাঠ ছেড়ে যায়নি। লীগ সাব-কমিটির রায় কিন্তু বেঙ্গল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এখানে হঠাৎ উল্টে গেল কেন?

তাছাড়া, সম্পাদক মশাই নিজেই ত জিজ্ঞেস করলেন মাঠে উপস্থিত তথাকথিত টেকনিক্যাল কমিটির সভ্যদের ও আম্পায়ারদের ভীনের স্ট্রোকের ব্যাপারে। তারা কি বলেছিলেন? বলেন নি কি যে সুপান্ত দেব কি ঠিক করেছেন? কয়েক ঘন্টা পরে সেই সব সভ্যদের হঠাৎ 'বদলে গেল মতটা'? কি করে এসব ওলোট পালোট হয় তার উত্তর নিশ্চয় পাঠকরা জানেন, আমি আর নাইবা বললাম।

বি এইচ এ, অফিসে গেলে শুধু নেই নেই রব — টাকা নেই, কিছু নেই, কি করে চালাব ইত্যাদি। আন্তরিকতা থাকলে অভাবের মধ্যেও সম্মান নিয়ে মাথা তুলে দাড়ান যায়। কিন্তু বি এইচ এ-র আইনজ্ঞ সম্পাদকের কাছে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেয়ে জরুরী ব্যাপার হল বিবেক এবং বিচারবুদ্ধি বিশেষ বিশেষ ঘাটে বাঁধা রেখে অনন্ত গদীতে সুখনিদ্রা দেওয়া।

পাঠকের পাতা



দারুণ, দারুণ হয়েছে "খেলার কথা"। কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটাই : খেলার কথা মানেই কি ফুটবলের কথা ? আমরা অবশ্যই ফুটবল-প্রেমিক বাঙালী। তাই বলে শুধুই ফুটবল ? না সম্পাদক মশাই, আমরা আরো কিছু চাই।

— তপু দাশগুপ্ত, কলকাতা-১৯

●

"ফুটবলের নিয়ম ও আইন" খুব ভাল লাগছে। সঙ্গের ছবিও চমৎকার। আমার কিন্তু মনে হয় রেফারী ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন বিখ্যাত কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক, যিনি কঠিন বিষয় সহজভাবে বলতে জানেন।

— অশোক ভট্টাচার্য, কলকাতা-৩১

●

"কী করছেন এখন অমল দত্ত" লেখাটি পড়ে বোঝা গেল স্বনামধন্য কোচ অমল দত্ত এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝা গেল না, লেখক এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন যে অমল দত্ত কোচ হিসেবে গতবার ব্যর্থ হন নি ? অমল দত্ত কী করছেন তা জানার কৌতূহল অনেকের থাকতেই পারে। কিছু গত বছরের ঝুলি ঝেড়ে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা হাস্যকর মনে হয়।

— দিলীপ সরকার, কলকাতা-৩২

●

"কী করছেন এখন অমল দত্ত" লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। ময়দানের বাস্তু ঘুঘুরা যতই চেষ্টা করুক, অমল দত্ত কখনও গুড়িয়ে যাবেন না। আমরা বিশ্বাস করি, লেখক-বর্ণিত হলুদ স্কুটারটি সামনের বছরই ময়দানে ফিরবেন সগৌরবে।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল নিয়েই চিরকাল লড়েছেন অমল দত্ত। অন্য অনেক স্টার কোচের মতো সেরা টীমেই মাথা গোঁজার চেষ্টা করেননি।

— সমীরণ ভট্টাচার্য, কলকাতা-৩১

যে দেশের জনসংখ্যা ৫০ কোটির বেশি, অথচ একজনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নেই — সেদেশে খেলা নিয়ে এত হৈ চৈ দেখলে বমি আসে। আপনারা নতুন কাগজ বার করলেন কেন ? কাদের কথা লিখবেন ? যারা দেশের মাটিতে বীরত্ব দেখিয়ে বাইরে গিয়ে গণ্ডা গণ্ডা গোল খায় ? এই ঘেন্নায় এদেশের কোনো খেলার কাগজ পড়িনা। ট্রেনে হঠাৎ হাতে আসায় পড়লাম 'খেলার কথা'। তাই এই চিঠি।

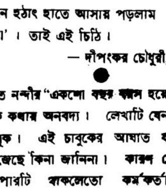
— দীপংকর চৌধুরী, পাটনা

●

মতি নন্দীর "একশো বছর পার হয়ে গেছে" এক কথায় অনবদ্য। লেখাটি যেন একটি চাবুক। এই চাবুকের আঘাত যথাস্থানে বেজেছে কিনা জানিনা। কারণ বোধশক্তি ব্যাপারটি থাকলেতো কর্মকর্তা হওয়া যায়না।

এই রকম লেখা আরো ছাপুন। এক বারে না হোক, দশবারে কাজ হতে পারে। আর তারচেয়েও বড় কথা, আমরা অন্ততঃ জানব, সত্যি কথা সরাসরি লেখার মতো কলম এখনও আছে।

— অরুণকুমার ঘোষ, শিলং



যারা পায় — তারা তো কতো কিছু পায়। হাজার হাজার টাকা, চাকরি, সমর্থকদের পিঠ-চাপড়ানি, ক্লাবের হয়ে দিল্লীদিল্লী ভ্রমণ, কাগজে কাগজে ছবি —আরো কতো কিছু। আপনারাও সেই তৈলাক্ত মাথাতেই তেল দেবেন ?

ময়দানের জুনিয়র ক্লাবগুলি, আর তাদের পুষ্টিহীন ফুটবলারদের কথা কি কেউ বলবেন না ? কতো কষ্ট করে বেঁচে আছে ছোট ছোট ক্লাব, কত অসুবিধা মাথায় নিয়ে ফুটবল খেলছে খোলা মাঠের ফুটবলাররা — সেসব কথা জানানোর জন্য অন্ততঃ কিছু পাতা খরচ করুন, এই অনুরোধ।

— শুভ সিন্‌হা, বনগাঁ

●

সম্পাদক মশাই, আমি আগাম নেমন্তন্ন করছি। আমাদের এখানে প্রতি বছর আগষ্ট মাসে এক বিখ্যাত প্রহসন হয় : "এশিয়ার দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা।" খুব ধুমধাম হয়। খাওয়াদাওয়াও হয় দেদার। আপনারা এলে নিশ্চয় খুব আদর যত্ন পাবেন।

আমি অবশ্য কমিটির সদস্য নই। তবে এই শহরের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমন্ত্রণ জানালাম।

— রূপক রায়, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

আমরা দুঃখিত

খেলার কথা পয়লা জুন সংখ্যায় দুটি বড় ভুল থেকে গেছে। 'ইস্টবেঙ্গল টেন্টে একদিন সকালে' লেখাটি পরপর দু'বার ছাপা হয়েছে। সাবির আলির রঙীন ছবির ওপর ফোটোগ্রাফার হিসেবে জয়ন্ত শেঠের নাম আছে। ছবিটি তুলেছেন সমর তরফদার। আমরা এরজন্য দুঃখিত।

ময়দানের ডায়েরী

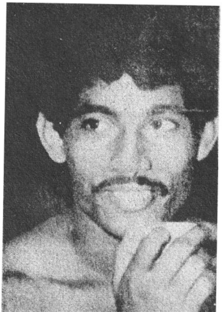
ডাক নাম

যদি বলি, গত বছর কলকাতা ফুটবল লীগের টপ স্কোরার ছিল পিন্টু — আপনি আমায় পাগল ভাববেন। কিন্তু যদি বলি, পিন্টু হল রঞ্জিত মুখার্জির ডাক নাম ?

বলুন তো বিশু কে? কুট্টি কার নাম? বাবন, ভোম্বল, গোপাল, বাবলু — এইসব ডাক-নাম কাদের ?

জেনে নিন ঃ বিশু — সুরজিৎ সেনগুপ্ত। কুট্টি — গৌতম সরকার। বাবন — চিন্ময় চ্যাটার্জি। ভোম্বল—সুভাষ ভৌমিক। গোপাল — প্রসূন ব্যানার্জি। বাবলু—সুব্রত ভট্টাচার্য।

কুট্টি তো গৌতমের ডাক-নাম। কিন্তু গৌতম কার ডাক-নাম? ভাস্কর গাঙ্গুলী।

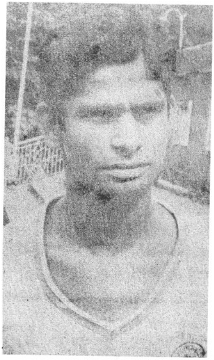


ভাস্কর গাঙ্গুলী।

পাড়ায় পাড়ায়

মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল এই দুটি ফুটবল ক্লাবকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিভিন্ন পাড়াগুলির চরিত্র গড়ে উঠেছে। তালতলা কট্টর মোহনবাগান পাড়া। যাদবপুর—বাঘাযতীন—গড়িয়াতে ইস্টবেঙ্গল হারলে বাড়িতে বাড়িতে অরন্ধন না হলেও, অনেক বাড়িতেই আলো নিবে থাকে — বিনা লোডশেডিংয়েই। শ্যামবাজার-বাগবাজার এলাকায় মোহনবাগান ত্রি-মুকুট জিতলে চাঁদা তুলে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। টালিগঞ্জে ইস্টবেঙ্গল লীগ পেলে ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়, আমহার্স্ট স্ট্রিটের মোড়ে মোড়ে লাল-হলুদ নিশান ওড়ে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের নিরঙ্কুশ রাজত্বে বিক্ষিপ্তভাবে মহামেডান স্পোর্টিং পাড়া এন্টালী-পার্ক সার্কাস। অবরে সবরে মহামেডান কোন ট্রফি জিতলে, এন্টালী-পার্ক সার্কাসে কাবাব আর মাটন রেজালার স্রোত বয়ে যায়।

এইসব ক্লাব কেন্দ্রিক পাড়াগুলোতে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েন তাঁরাই, যাঁরা "হংস মধ্যে বক যথা।" অর্থাৎ তালতলার ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টার কিংবা বাঘা যতীনের মোহনবাগানের অনুরাগী প্রিয় দল জিতলেও দুঃখ আর বেদনার অভি-ব্যক্তি মুখে ফুটিয়ে যে ভাবে অভিনয় করতে করতে বাড়ি ফেরেন, সেটা দেখলে বোধ হয় উত্তমকুমারও লজ্জা পেতেন।



হাবিব

মিনি ব্যাটেল

শনিবার ১৩ মে ইস্টবেঙ্গল গুণে গুণে চার গোল দিয়ে হারাল মোহনবাগানকে। আর তার পরদিন ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ৫-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গলকে। ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে চারটি গোল করেছিল সুরজিত (২), মিহির আর সমরেশ চৌধুরী। মোহনবাগানের পাঁচটির মধ্যে হ্যাট্রিকসহ তিনটি গোল বিদেশ বসুর, বাকি দুটি গৌতম সরকার আর হাবিবের। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একটি গোল শোধ দিল রঞ্জিত। মাঠে প্রচুর দর্শক হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় হাবিব আর প্রশান্ত ব্যানার্জীকে রেফারী পাঁচ মিনিটের জন্য মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিল। পরে অবশ্য দুজনকেই আবার ডেকে নেওয়া হয়।

পাঠক, আপনার নিশ্চয়ই চোখ এতক্ষণে ছানাবড়া। ভাবছেন এই খেলা আবার হল কোথায়? আপনার দোষ নেই। সেদিন পাঁচ নম্বর বাসে ধর্মতলা থেকে গড়িয়া যাওয়ার সময় ভবানীপুরের কাছাকাছি মাইক্রোফোনে মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার বাংলা রিলে শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম। পাশের পার্কে প্রচুর ভিড় দেখে ভাবলাম হয়ত কোন প্রদর্শনী খেলা, যার খোঁজ আমি রাখিনা। বাস থেকে নেমে পার্কে ঢুকেই দেখি একদল বালখিল্য প্রসূন—প্রসূন করে চিল-চিৎকার ছাড়ছে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রসূনকে দেখলাম। বয়েস বছর বারো। এখনও গোঁফের রেখা ওঠেনি। বাঁ পায়ে কেতাদুরস্ত একটা শট নিল। সুরজিতকে দেখলাম একটু খোঁড়াচ্ছে, খুব বেশী হলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। হাবিব অবশ্য বয়সে একটু বড়, ক্লাস নাইনে হতে পারে। রঞ্জিত নেহাৎই নাবালক, ইজেরটা ঢলঢল করে নেমে আসছে। বোঝা গেল, পাড়ার বাচ্চাদের মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল খেলার "খেলা।"

আমি দ্বিতীয় দিনের খেলার দর্শক ছিলাম। পাশের এক উৎসাহী বয়স্ক দর্শকের কাছেই শুনলাম আগের দিন ইস্টবেঙ্গল জিতেছে চার গোলে, মাসে একবার করে নাকি এই ধরনের আসর বসে। ভদ্রলোক সগর্বে জানিয়ে দিতে ভুললেন না "আমি হাবিবের বাবা।"

খেলার কথার পক্ষ হইতে শ্রীবিপ্লব দাশগুপ্ত, ৩১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দীপ্তি প্রিন্টিং, ১৩এম, আরিফ রোড, কলিকাতা-৬৭ হইতে মুদ্রিত



মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য/প্রদীপ সোম

